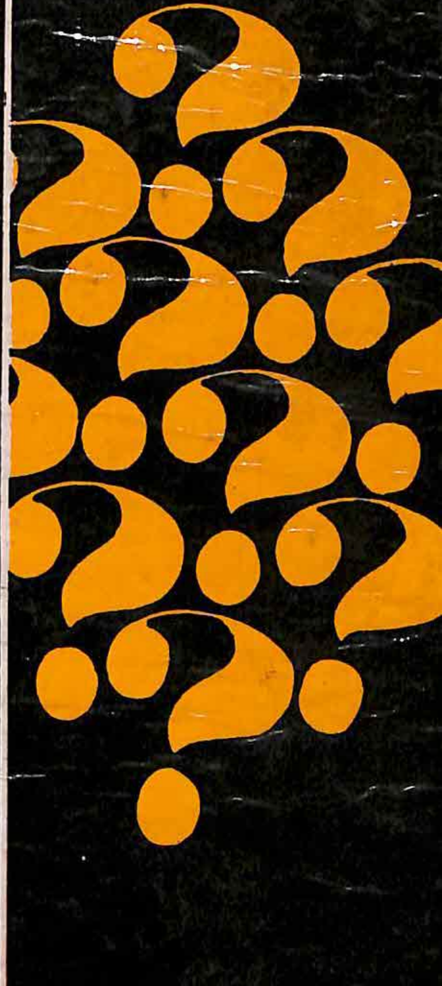
ছোটদের

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

সুধাংশু পাত্র





ছোটদের বিজ্ঞান–জিজ্ঞাসা

(মানব শরীর ও রোগ-ব্যাধি)

সুধাংশু পাত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
—ডিসেম্বর ১৯৮৩
—অগ্রহায়ণ ১৩৯০

তৃতীয় সংস্করণ :
—নভেম্বর ১৯৮৯
—কার্তিক ১৩৯৬

প্রকাশক :
শ্রী সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

মুদ্রাকর :
শ্রী নিত্যানন্দ পাঁজা
মা কালী প্রেস
৪/১ই, বিডন রো
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ৮ টাকা

আমাদের চারদিকের বস্তুরাশি, জীব ও উদ্ভিদ-জগৎ সম্পর্কে তরুণমনে যথেষ্ট কৌতূহল। প্রকৃত-পক্ষে তাদেরই কৌতূহল চরিতার্থ করতে এই পুস্তকের পরিকল্পনা।

বাজারে এই জাতীয় পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং সেগুলি রচিত হয়েছে বিজ্ঞানের সব শাখা থেকে কিছু কিছু প্রশ্ন চয়ন করে। কিন্তু বিজ্ঞানের এক একটি শাখায় সহস্র-সহস্র প্রশ্ন আছে। সমস্ত জিজ্ঞাসাকে একত্রিত করা একটি দুরূহ ব্যাপার। তবু তরুণমনের চাহিদা মেটাতে বিজ্ঞানের এক-একটি শাখা থেকে এমন কিছু প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়েছে যাতে সেই শাখাটি সম্বন্ধে তাদের মনে মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে উঠতে পারে। আর চেষ্টা করা হয়েছে অবশ্যজ্ঞাতব্য কতকগুলি প্রশ্নের সমাধান করতে।

বিজ্ঞানের সব শাখার সাধারণ জিজ্ঞাসাকে একত্রিত করলে পুস্তকের কলেবর ভয়ানকভাবে বেড়ে উঠবে। তখন পুস্তকখানিই তাদের কাছে ভীতি-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। উক্ত কারণে বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান শাখা অবলম্বন করে পৃথক পৃথক পুস্তক রচনার ইচ্ছা আছে। এই পর্যায়ের এই প্রথম পুস্তক—মানবশরীর সম্বন্ধীয়।

যাদের জন্য এই দীন প্রচেষ্টা তারা উপকৃত হলে এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল বর্ধিত হলে নিজের শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

সুধাংশু পাত্র

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই ঃ

পদার্থ বিজ্ঞানের সহস্র জিজ্ঞাসা
মহাকাশ বিদ্যা ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা
বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ
জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ
বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ
বিজ্ঞানী চরিতকথা
বিজ্ঞানের অমর প্রতিভা
মনের মত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গপ্পো
ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযান
জীব জগতের বিস্ময়
বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত
আজকের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
বিজ্ঞানের সহজপাঠ
মহাসাগরের মহাবিস্ময়
খাদ্য, পুষ্টি ও পরমায়ু
সভ্যতার আদিপর্বের আবিষ্কার ও তৎপরতা
পশুপাখী ও পতঙ্গের গপ্পো

অনিন্দিত-কে

* **মেরুদণ্ডী প্রাণী কাদের বলা হয় ?**

যাদের মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া থাকে এবং যাদের মাথার খুলি বা করোটি আছে তাদেরই বলা হয় মেরুদণ্ডী প্রাণী।

* **মেরুদণ্ডী প্রাণী কয়ভাগে বিভক্ত এবং কি কি ?**

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রধানত সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়। (১) চোয়ালহীন মাছ জাতীয় প্রাণী বা সাইক্লোস্টোম (২) হাঙ্গর প্রভৃতি কোমলাস্থি বিশিষ্ট মাছ (৩) শক্ত হাড় বিশিষ্ট মাছ (৪) উভচর (৫) সরীসৃপ (৬) পাখী ও (৭) স্তন্যপায়ী।

* **স্তন্যপায়ী প্রাণী কাদের বলা হয় ?**

স্তন্যপায়ীদের ইংরাজীতে বলা হয় "ম্যামালস্"। গ্রীক "মেমা" শব্দটির অর্থ স্তন। অর্থাৎ এই জাতীয় স্ত্রী প্রাণীদের থাকে স্তন। ওরা নিজের আকৃতি অনুযায়ী শাবক প্রসব করে এবং শাবকরা মায়ের দুধ পান করে জীবন-ধারণ করে থাকে।

তবে স্তন্যপায়ীদের দুটি প্রজাতির ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম আছে। হংসচঞ্চু বিশিষ্ট প্ল্যাটিপাস এবং পিপীলিকাভুক প্রাণী এচিড্না ডিম প্রসব করে। কিন্তু ডিম ফুটে বাচ্চা বার হলে বাচ্চারা মায়ের দুধ পান করে থাকে।

* **স্তন্যপায়ীরা কয় শ্রেণীতে বিভক্ত এবং বিভাগগুলি কি কি ?**

স্তন্যপায়ীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) যাদের বাচ্চা মাতৃগর্ভে পরিপূর্ণতা লাভ করে তাদের বলা হয় প্ল্যাসেন্টাল (২) ক্যাঙ্গারু জাতীয় প্রাণী—যাদের বাচ্চা অর্ধপরিপুষ্ট অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় এবং মায়ের বুক সংলগ্ন থলিতে স্থান লাভ করে পরিপুষ্ট হয় তাদের বলা হয়

"পউচেস" বা অঙ্কগর্ভ প্রাণী (৩) যারা ডিম প্রসব করে অথচ ডিম ফুটলে শাবকরা মায়ের দুধ পান করে তাদের বলা হয় "মনোট্রিমস"।

* প্রাইমেটস বা শ্রেষ্ঠ বর্গযুক্ত প্রাণী কাদের বলা হয়?

মানুষ, বনমানুষ, বানর ইত্যাদিকে বলা হয় প্রাইমেটস্। এরা দু শ্রেণীতে বিভক্ত। উচ্চ প্রাইমেটস্ ও নিম্ন প্রাইমেটস্। মানুষ, গরিলা, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি উচ্চ প্রাইমেটস্ এবং বানর, হনুমান ইত্যাদি নিম্ন প্রাইমেটস্।

* পৃথিবীর জীবগোষ্ঠির মধ্যে মানুষ স্বতন্ত্র কেন?

মানুষের উন্নত মস্তিষ্ক মানুষকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। পৃথিবীতে যত জীব আছে, তাদের মধ্যে একমাত্র মানুষের মস্তিষ্কের ওজন বেশী। তাই বুদ্ধিবলে সে করায়ত্ত করেছে ধরণীকে।

* মানবদেহের একক কি?

ক্ষুদ্রাতিতম ক্ষুদ্র কোষ বা সেল্। কেবল মানুষ নয় যে কোন জীবদেহে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ নিয়ে গঠিত। তাই কোষকে জীবনের একক বলা হয়।

* কে কবে কোষ আবিষ্কার করেছেন?

রবার্ট হুক ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উদ্ভিদদেহে কোষের সন্ধান লাভ করেছিলেন। সেল্ নামটি তারই দেওয়া।

* জীবকোষে কোন্ কোন্ বস্তু থাকে?

সাধারণত প্রাণপঙ্ক বা বর্ণহীন, ঈষৎ স্বচ্ছ এবং জেলির মত থলথলে পদার্থ প্রোটোপ্লাজম এবং প্রোটোপ্লাজমের পরিধি বরাবর একটি সূক্ষ্ম পর্দা থাকে। পর্দাটিকে বলা হয় প্লাজমা মেমব্রেন।

* প্রোটোপ্লাজমে অবস্থিত প্রধান বস্তুগুলির নাম কি?

সজীব প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তু বা অরগানেলি এবং প্রোটোপ্লাজমের বিপাকের ফলে উৎপন্ন জড় বস্তু বা আরগ্যাসটিক বস্তু।

আবার প্রোটোপ্লাজমীয় বস্তুগুলির মধ্যে প্রোটোপ্লাজম দ্বারা নির্মিত একটি সুগঠিত নিউক্লিয়াসই প্রধান। জড়বস্তুগুলির মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ জল এবং মাত্র ১০ ভাগ অজৈব ও জৈব পদার্থ থাকে।

অজৈব পদার্থগুলি প্রধানত সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রন। অপরদিকে জৈব পদার্থগুলির মধ্যে প্রোটিনের ভাগই সর্বাধিক। তাছাড়া থাকে স্নেহ ও শর্করা জাতীয় পদার্থ।

*** প্রোটোপ্লাজম কে কবে আবিষ্কার করেন?**

সম্ভবত ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ডুজারজিন নামে এক বিজ্ঞানী কোষ মধ্যস্থিত প্রোটোপ্লাজমের সন্ধান পেয়েছিলেন। নামকরণ করেছেন পার্কিঞ্জি নামে আর এক বিজ্ঞানী।

*** কোষ মধ্যস্থিত নিউক্লিয়াসটি কেমন এবং ওতে কোন্ কোন্ বস্তু থাকে?**

নিউক্লিয়াসটি বর্তুলাকার এবং পর্দার দ্বারা বেষ্টিত। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে বেশ ভাল ভাবেই দেখা যায়। পর্দার ভেতরে থাকে ডি. এন. এ এবং প্রোটিন নির্মিত নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম।

*** ক্রোমোজোম কি?**

নিউক্লিয়াসের মধ্যে জটপাকানো সরু সরু সূতার মত এক ধরনের জিনিস থাকে! তাকে বলা হয় ক্রোমাটিন তন্তু। কোষ বিভাজনের সময় এগুলি সূতার মত স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। তখনই এদের বলা হয় ক্রোমোজোম। দেখা গেছে, প্রত্যেক প্রজাতির কোষের মধ্যে এই ক্রোমোজোম থাকে নিদিষ্ট সংখ্যক।

*** মানুষের দেহস্থিত প্রতিটি কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত?**

২৩ জোড়া বা ৪৬টি। তবে রক্তকোষে এবং জননকোষে থাকে না।

*** ডি. এন. এ. কি এবং কোন্ কোন্ জিনিস নিয়ে গঠিত?**

জীবকোষের একটি উপাদান ডিন. এন. এ. সংক্ষেপিত নাম। পুরো নাম ডিঅক্সিরিবো নিউক্লিক অ্যাসিড। চার রকমের জৈব। ক্ষারক দিয়ে গঠিত ডি. এন. এ.। ক্ষারকগুলির নাম অ্যাডেনিন, গুয়েনিন, সাইটোসিন ও থাইনিন।

আসলে ডি. এন. এ হচ্ছে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহত্তম অণু। এককগুলির নাম নিউক্লিওটাইড। নিউক্লিওটাইডের মধ্যে থাকে উপরে বর্ণিত জৈব ক্ষারকগুলির যে

কোন একটি, পাঁচটি কারবন যুক্ত শর্করা অণু বা ডিঅক্সিরাইবোজ এবং একটি ফসফেট বা ফসফরিক অ্যাসিড অণু।

একটি জৈব ক্ষারক, একটি ডিঅক্সিরাইবোজ ও একটি ফসফেট মিলে একটি একক নিউক্লিওটাইড, কয়েকটি নিউক্লিওটাইড মিলে গঠন করে সূতার মত পলিনিউক্লিওনাট এবং দুটি পলিনিউক্লিওনাট সূতার পাক দিয়ে গঠন করে ডি. এন. এ-র বৃহত্তম অণু। এদের বৈশিষ্ট্য, যখনই সূতার মত পাক দিয়ে ডি. এন. এ. অণু গঠন করে তখনই একটির অ্যাডেনিন সব সময় অপরটির থাইনিনের সঙ্গে এবং একটির গুয়েনিন অপরটির সাইটোসিনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

* জিন কি ?

জিন হচ্ছে একটি অম্লধর্মী যৌগিক পদার্থ এবং এটি ক্রোমোজোমেই থাকে। এরা নিজে নিজে বিভাজিত হতে পারে।

জিনরা বংশগতির ধারক ও বাহক। অর্থাৎ পিতামাতার দেহগত ও মানসিক দোষগুণ সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পাওয়ার মূলে আছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ঐ জিন। এর উপাদান ঐ ডি. এন. এ. বা ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড।

*** একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহে কোষের সংখ্যা কত ?**

প্রায় ১০১৪ টি। অর্থাৎ ১০কে চৌদ্দবার ১০ দিয়ে গুণ করলে যা হয়।

*** মানুষের জীবন শুরু হয় কতটি কোষের মাধ্যমে ?**

মাত্র একটি কোষের মাধ্যমে। কেবল মানুষ নয়, যে কোন জীব জীবন শুরু করে একটিমাত্র কোষকে অবলম্বন করে।

* এককোষ থেকে কেমন করে বহুকোষের সৃষ্টি হয় ?

কোষ বিভাজনের দ্বারা।

* কোষ বিভাজন কেমন করে হয়ে থাকে ?

জীব মাত্রই জীবন শুরু করে একটি কোষের মাধ্যমে। কোষটি সুগঠিত হয়ে নির্দিষ্ট আকৃতি ও প্রকৃতি লাভের পর কোন এক অজানা কারণে কোষ মধ্যস্থিত নিউক্লিয়াসটি ভেঙে দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উক্ত প্রক্রিয়াটিকে বলে কোষ বিভাজন। এক থেকে দুই, দুই থেকে

চার, এইভাবে চলতে থাকে এবং বহুকোষী জীবের উদ্ভব হয়।

কোষের নিউক্লিয়াসে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে—যা জীবের বৈশিষ্ট্য তথা দোষগুণ ইত্যাদির ধারক ও বাহক, নিউক্লিয়াসের বিভাজনে ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে বিভাজিত হয়। তাই উৎপন্ন কোষের মধ্যে পূর্ববর্তী কোষের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যে কোষটি পরিপূর্ণতা লাভের পর বিভাজিত হয় সেটিকে বলা হয় মাতৃকোষ এবং তা থেকে উৎপন্ন কোষটিকে বলা হয় অপত্য কোষ।

* কোষ কত রকমের এবং কি কি?

কোষ সাধারণত দু-ধরনের। এক জাতীয় কোষের দ্বারা দেহ গঠিত হয় এবং অপর জাতীয় কোষ দ্বারা জনন অঙ্গে উৎপন্ন হয় জননকোষ। পূর্ববর্তী কোষকে বলে দেহকোষ এবং পরবর্তী কোষকে বলে জনন-কোষ। দু-ধরনের কোষই বিভাজিত হয়। দেহকোষের বিভাজনকে মাইটোসিস আর জননকোষের বিভাজনকে বলা হয় মায়োসিস।

* **কোষ বিভাজন কতদিন ধরে চলতে থাকে?**

সারা জীবন। তবে যৌবনাবস্থা পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত দেহবৃদ্ধি চলতে থাকে ততদিন হয় দ্রুত। তারপর বিভাজনের হার মন্দীভূত হয়।

* **দেহস্থ কোষ কি বিনষ্ট হয়?**

অবশ্যই হয়। মৃতকোষগুলিকে রক্তই বহন করে নিয়ে যায় হৃৎপিণ্ডে। সেইখানে তাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। দেহত্বকের বাহিরের স্তরটিও মৃতকোষের স্তর। একসময় ওরা ঝরে পড়ে অথচ আমরা বুঝতে পারি না।

দেহবৃদ্ধি ব্যাহত হলে পর অর্থাৎ প্রায় ২৫ বছর বয়সের পর থেকে স্বাভাবিক কারণে কোষ নষ্ট হয় অধিক পরিমাণে। এই সময় থেকে নতুন কোষের সৃষ্টি হয় না। যতগুলি নষ্ট হয় বিভাজনের ফলে কেবল সেই পরিমাণ কোষেরই উৎপত্তি হয়। যদি কোন জায়গায় অস্বাভাবিকভাবে কোষ বৃদ্ধি ঘটে তাহলে তাকে রোগের লক্ষণ বলতে হবে।

* বংশগতি কাকে বলে ?

যে প্রক্রিয়ায় ক্রোমোজোমের জিনে অবস্থিত পিতামাতার দৈহিক বৈশিষ্ট্য, দোষ গুণ ইত্যাদি সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পায় তাকেই বলে বংশগতি। টাক, কটাচোখ, চুলের বৈশিষ্ট্য, নাকের বৈশিষ্ট্য, গায়ের রঙ ইত্যাদি বংশগতির জন্য বংশানুক্রমে লক্ষ্য করা যায়।

* মাতৃজঠরে মানুষ জীবন শুরু করে কেমন করে ?

পিতার শুক্রাণু ও মাতার ডিম্বাণু মিলে প্রথমে গঠিত হয় জাইগোট নামে একটি কোষ। একটি পূর্ণাঙ্গ কোষে থাকে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম। আদি এই কোষে থাকে পিতার দেওয়া ২৩টি ও মায়ের দেওয়া ২৩টি ক্রোমোজোম। ফলে ২৩ জোড়া পূর্ণ হয়। জাইগোটটি বিভাজিত হয়ে প্রথমে ফাঁপা গোলকের মত হয়। তখন তাকে বলে ব্লাষ্টুলা। পরবর্তী পর্যায়ে গোলকটির একমুখ ভেতরে ঢুকে গিয়ে তলা স্পর্শ করে। এই পর্যায়কে বলে গ্যাষ্ট্রুলা পর্ব। এই পর্যায়ের শেষে বহিঃস্ত্বক, মধ্যস্ত্বক ও অন্তঃস্ত্বক নামে তিনটি কোষ-স্তর গঠিত হয়। তারপরে নানাবিধ কলাতন্ত্রের মাধ্যমে অঙ্গ গঠিত হয়। শেষে পূর্ণাঙ্গ হলে ভূমিষ্ঠ হয় শিশু।

* প্রবলগুণ কাকে বলে ?

সন্তানের মধ্যে পিতামাতার উভয়ের গুণ, দোষ ইত্যাদি মিশে যায়। কিন্তু উভয়ের গুণ প্রকাশ পায় না। একজনের গুণ প্রকাশ পায় এবং আর একজনের গুণ গুপ্ত অবস্থায় থাকে। যে গুণটি প্রকাশ পায় তাকেই বলা হয় প্রবলগুণ।

* কলা ও কলাতন্ত্র কাকে বলে ?

দেহের প্রতিটি কোষ স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। কারণ, পুন পুন কোষ বিভাজনের ফলে সৃষ্ট মানবদেহের প্রতিটি কোষের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লোপ পায় অনেকখানি। এমন কি আকৃতি ও প্রকৃতিগত তফাৎও এসে যায়। এই অবস্থায় একই জায়গায় অবস্থানকারী অসংখ্য কোষ সমষ্টিগতভাবে কাজ করে থাকে। ঐ কোষ সমষ্টি—যা একত্রিত অবস্থায় এক একটি বিশেষ কাজ সম্পাদন করে থাকে, তাকেই বলা হয় কলা।

ঐ কোষ সমষ্টি বা কলা দেহের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত গঠন করে অঙ্গ। আবার কয়েকটি অঙ্গ মিলে সুনির্দিষ্ট কোন কাজের জন্য গঠিত হয়েছে তন্ত্র।

আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে চালনা করার জন্য পেশী, অনুভূতি আদান-প্রদানের জন্য স্নায়ু, রস ক্ষরণের জন্য নানাগ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ড ইত্যাদি এক এক ধরনের কলা।

মানবদেহকে কতটি তন্ত্রে ভাগ করা হয়েছে এবং কি কি?

মানবদেহকে প্রধানত ৬টি তন্ত্রে ভাগ করা হয়েছে। তন্ত্রগুলির নাম (১) অস্থিতন্ত্র (২) অস্থিসন্ধি তন্ত্র (৩) পেশীতন্ত্র (৪) স্নায়ুতন্ত্র (৫) হৃদবাহ তন্ত্র ও (৬) আন্তর্যন্ত্রীয় তন্ত্র।

*** মানবদেহে কত রকমের কলা দিয়ে গঠিত?**

প্রধানত ৪ রকমের কলা দিয়ে মানবদেহ গঠিত। কলাগুলির নাম (১) আবরণী কলা (২) যোগকলা (৩) পেশীকলা ও (৪) স্নায়ুকলা।

*** শরীরের কোন কোন অংশে আবরণী কলা বিদ্যমান?**

দেহের বাহিরের অংশ অর্থাৎ চামড়া, নখ, লোম ইত্যাদি যে সব জায়গায় আছে তারই তলায়, দেহগহ্বরের পরিধিতে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড ফুসফুস প্রভৃতি স্থানে, পৌষ্টিক নালীতে, শ্বাসনালীতে এবং নাসাপথে আবরণী কলা বিদ্যমান।

*** যোগ কলা কাকে বলে?**

সাধারণত যে সব কলা দেহের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদেরই বলা হয় যোগ কলা। দেহের অস্থি, রক্ত ইত্যাদি এক এক ধরনের যোগ কলা।

*** পঞ্চ ইন্দ্রিয় কি কি?**

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। এদের দ্বারাই আমরা পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ ইত্যাদি অনুভব করে থাকি।

*** শরীরের বাহিরের আবরণকে কি বলে এবং তার কাজ কি?**

শরীরের বাহিরের আবরণকে বলা হয় ত্বক। ত্বকের প্রধান দুটি কাজ, শরীরের ক্ষতিকারক পদার্থগুলিকে ঘামের সাহায্যে বাহিরে বার

করে দেওয়া এবং শীত ও গরম থেকে শরীরকে রক্ষা করা। তাছাড়াও অন্যান্য কতকগুলি কাজ সম্পাদন করে থাকে। যেমন—

(১) শরীরের মেদ প্রভৃতি বাড়তি জিনিষগুলো অনেক সময় চামড়ার তলায় জমা রাখে। যখন আমরা নিয়মিত আহার করি কিংবা বেশী খাই তখন ত্বক বাড়তি জিনিষগুলোকে তলায় জমা করে। আর খাওয়া বন্ধ করলে অর্থাৎ ক্ষুধার উদ্রেক সত্বেও না খেলে ঐ মেদ চামড়ার তলা থেকে রক্তে যায় এবং আমাদের শক্তি যোগায়।

(২) চামড়ার তলায় কতকগুলি কৈশিক রক্তনালী বিদ্যমান। ঐ রক্তনালী কিছু রক্তকে ধরে রাখে। প্রয়োজন হলে এই রক্ত শরীরের যে কোন স্থানে সঞ্চালিত করতে পারে।

(৩) শরীরের চামড়া শরীরের তাপকে বাড়াতে কিংবা কমাতে পারে। যখন অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়ে অথবা কোন ঠাণ্ডা জিনিসের সংস্পর্শে আসি তখন শরীরের তাপ যাতে বাহিরে না যেতে পারে তার জন্য রক্ত কিছুটা ভেতরে চলে যায়। আবার গরম হলে রক্তনালীগুলির মুখ খুলে যায় এবং চামড়ায় এসে জমা হয়।

* ত্বক দিয়ে বাহিরের স্পর্শ আমরা কিভাবে অনুভব করি?

আমাদের দেহের চামড়ার তলায় সর্বত্র লুকিয়ে আছে অনেকগুলি স্নায়ুর প্রান্তদেশ। কেউ স্পর্শ করলে এমনকি মৃদু বাতাস প্রবাহিত হলেও সেই সব স্নায়ুর প্রান্তসীমায় ধরা পড়ে। তারপর ঐ স্নায়ুই মস্তিষ্কে খবর পাঠিয়ে দেয়। যেহেতু আমাদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন অনুভূতির জন্য স্থান নির্দিষ্ট আছে। স্পর্শ, ব্যথা বেদনা ইত্যাদি অনুভূতির স্থানে স্নায়ুরা খবর পাঠালেই আমরা এগুলি অনুভব করি। অবশ্য মুহূর্তের মধ্যেই উক্ত কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

* চামড়ার কয়টি স্তর এবং স্তরগুলির কাজ কি?

আমাদের দেহের এত যে পাতলা চামড়া তারও আছে সাতটি স্তর। বাহিরের পাঁচটি স্তরকে একত্রে বলা হয় বহিঃত্বক এবং ভেতরের দুটি স্তরকে একত্রে বলা হয় অন্তঃত্বক। সবচেয়ে বাহিরের স্তরটি মরা কোষের স্তর দিয়ে গঠিত এবং এগুলি আমাদের অজান্তেই ঝরে পড়ে। তবে

অন্তঃত্বক অর্থাৎ নিচের দুটি স্তরই প্রকৃতপক্ষে আসল ত্বক। তারই তলায় লুকিয়ে আছে স্নায়ুদের প্রান্তদেশ, রক্তনালী, নানা রকম গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি।

ত্বককে আমাদের রক্ষাকবচ বললে মনে হয় ভুল বলা হবে না। ত্বক ভাল থাকলে বাহিরের জীবাণুরা ত্বককে ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারে না। এছাড়া পূর্ববর্ণিত অন্যান্য কাজ তো আছেই।

* **হাতের চেটো পায়ের পাতায় চামড়া মোটা কেন?**

আসলে এসব জায়গার চামড়ার আরও কতকগুলি মরা কোষের স্তর থাকে। চাপ, ঘর্ষণ ইত্যাদিকে উপেক্ষা করার জন্য ঐ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

* **ঘাম কোথায় উৎপন্ন হয় এবং ঝরে কেন?**

অন্তঃত্বকের তলায় একরকম গ্রন্থি থাকে। তাকে বলা হয় স্বেদ-গ্রন্থি বা ঘর্মগ্রন্থি। গ্রন্থিগুলি অনেকটা গোটানো নলের মত। ঐখানেই ঘাম তৈরী হয়। বাষ্পায়নের ফলে শরীরকে শীতল করার জন্য ঘাম বাহিরে বেরিয়ে আসে। তাছাড়া শরীরের অভ্যন্তরের নানা দূষিত পদার্থকে বার করে দেওয়াও ঘাম ঝরার আর একটি কাজ।

* **দেহে ঘর্মগ্রন্থির পরিমাণ কত?**

দেহে ২০ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ ঘর্মগ্রন্থি আছে বলে অনুমান করা হয়। তবে মাথায়, হাতে ও পায়ে ঘর্মগ্রন্থির সংখ্যা সর্বাধিক গ্রন্থি-গুলি ত্বকের ঠিক উপরের তলে উন্মুক্ত হয়।

* **লোমকূপের কাজ কি?**

শরীরের চামড়ার গায়ে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। ঘর্মগ্রন্থিতে উৎপন্ন ঘাম ঐ ছিদ্রপথেই বেরিয়ে আসে। আসলে এরাই লোমকূপ।

আশ্চর্যের কথা, এত যে ক্ষুদ্র লোমকূপ—তার মুখেও থাকে ঢাক-নার মত জিনিস। তাই খুলতেও পারে এবং বন্ধও হতে পারে। ঐ খোলা ও বন্ধ হওয়ার দ্বারাই ঘামের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। ঘাম বেরিয়ে এলে বাষ্পীভবন হয় এবং শরীরকে শীতল রাখে। যখন শরীরকে ঠাণ্ডা রাখার প্রয়োজন হয় না তখন ঘর্মগ্রন্থির মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এই উপায়েই সে বজায় রাখে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রাকে।

* গরমের দিনে বেশী ঘাম নির্গত হয় কেন ?

পশ্চাৎ পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে অ্যান্টিডাইয়ুরেটিক নামক এক ধরনের হরমোনের ক্ষরণ আবহাওয়ার উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। উষ্ণতা বৃদ্ধি হলে উক্ত হরমোন ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়। ফলে রেচননালীর জল শোষণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আর তখনই বৃদ্ধি পায় ঘর্মগ্রন্থি থেকে ঘর্মক্ষরণের পরিমাণ।

* কেউ কালো কেউ বা ফর্সা কেন ?

চামড়ার অন্তঃত্বকে থাকে একরকম রঞ্জক কলা। সেখান থেকে নিঃসৃত একরকম কালো রঞ্জক পদার্থ সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মিগুলি, বিশেষ করে ইনফ্রারেড্ রশ্মি থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্য দেহের বাহিরে একটি আস্তরণ সৃষ্টি করে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলির প্রভাব বেশী থাকায় সেখানকার মানুষের দেহের চামড়ার আস্তরণটি গাঢ় কালো রঙের। অপরদিকে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ক্ষতিকর রশ্মির প্রভাব কম বলে কালো রঙের আস্তরণের প্রয়োজন হয় না। তাই রঙ ফর্সা ও সাদা। অপরদিকে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, গায়ের রঙের জন্য বংশধারাও কিছুটা দায়ী।

* আমাদের চোখ দুটো কেমন ?

আমাদের চোখ দুটো অনেকটা গোল গোল বলের মত। তার মধ্যে আছে কত কারিগরি। চারদিকটা ঘিরে খুব শক্ত ও অস্বচ্ছ একটা আবরণ আর সামনের দিকের কিছুটা অংশ স্বচ্ছ। শুধু ঐ অংশটি দিয়ে বাহিরের আলো ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। অস্বচ্ছ অংশটিকে শ্বেতমণ্ডল বলা হয়।

স্বচ্ছ অংশটির নাম অচ্ছোদপটল। অচ্ছোদপটলের ঠিক পেছনে কনীনিকা নামে একটি কালো পর্দা আছে। পর্দার মাঝখানে থাকে একটি ফুটো—যাকে বলা হয় তারারন্ধ্র। আর ফুটোটার ভেতরে থাকে একটা উত্তাল লেন্স। অর্থাৎ লেন্সটির মাঝখানটা পুরু অথচ পাশের দিকে ক্রমশ পাতলা।

লেন্সের সামনে থাকে এক রকম তরল পদার্থ এবং পেছনে থাকে

অপেক্ষাকৃত ঘন তরল—অনেকটা জেলির মত। তবে তরলগুলি কাচের মত বেশ স্বচ্ছ। ফলে ভেতরে আলো প্রবেশের কোন অসুবিধা হয় না। তারারন্ধ্র আপনা হতে কখনও বড় হয়, আবার কখনও ছোট হয়। কম আলোতে দেখতে গেলে প্রসারিত হয়। আলোকের তীব্রতা বাড়লে সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ করে।

একেবারে পেছনের দিকে থাকে অক্ষিপট। একে পাতলা একটা আলোকগ্রন্থী পর্দা বলা যেতে পারে! আমাদের চোখের সামনে যা ঘটে সম্মুখস্থ লেন্স তার সব কিছুই ফেলছে পেছনের অক্ষিপটে। ঠিক যেন সিনেমার পর্দার মত ব্যাপারটা। ছবির পর ছবি এসে পড়ছে পর্দার উপরে। অক্ষিপটের ঠিক পেছনেই থাকে স্নায়ু। দৃশ্যাবলীকে ঐ স্নায়ুই প্রেরণ করছে মস্তিষ্কের পেছন ভাগে।

মানুষের চোখ দুটো কতই না সুন্দর। আসলে চক্ষু গোলক দুটি আদৌ সুন্দর নয়। চোখের দুটি পাতাই তাকে সুন্দর করে ঘিরে রেখেছে। আরও সৌন্দর্য বর্ধন করছে উপরের ভ্রূ দুটো।

* আমরা কেমন করে দেখতে পাই?

কোন বস্তু থেকে আলোক প্রতিফলিত হয়ে প্রথমে অচ্ছোদপটল, পরে তারারন্ধ্র, লেন্স, জেলির মত তরলপদার্থ ইত্যাদি হয়ে শেষে অক্ষিপটে এসে পড়ে। তখনই আমাদের চোখের সামনের বস্তুর একটি উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হয় অক্ষিপটে। সেখানে 'রড' ও 'কোণের' আকৃতি বিশিষ্ট কতকগুলো কোষ আছে। ঐ কোষগুলির নামও 'রড কোষ' ও 'কোণ কোষ'। এদের উপর আলো এসে পড়লেই অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে খবর প্রেরিত হয়। তখনই মস্তিষ্কে অনুভূতি জাগে এবং মুহূর্তের মধ্যে প্রতিবিম্বটিও সোজা হয়ে যায়। আর তখনই আমাদের দেখার কাজ সম্পন্ন হয়।

* আমরা আলোতে দেখতে পাই কিন্তু অন্ধকারে দেখতে পাইনা কেন?

আমাদের চোখের অভ্যন্তরে যে অক্ষিপট আছে, সেটি আলোতেই ভালভাবে সাড়া দেয়। অপর পক্ষে যে 'রড' ও 'কোণ' কোষগুলি

আছে তারা একই ধরনের কাজ করে না। 'কোণ' কোষগুলি কেবল মাত্র উজ্জ্বল আলোতে কাজ করে এবং 'রড' কোষগুলি মৃদু আলোতেও সাড়া দেয়। দেখা গেছে, অন্ধকারে দেখতে হলে যে পরিমাণ 'রড' কোষের প্রয়োজন সে পরিমাণ আমাদের চোখে নেই। যদিও সংখ্যাটা নিতান্ত কম নয়। প্রায় সাড়ে বার কোটির মত। সে তুলনায় 'কোণ' সেল অনেক কম—মাত্র চল্লিশ লক্ষের কাছাকাছি। উপযুক্ত পরিমাণ 'রড' কোষের অভাব হেতু রাত্রিকালে আমরা দেখতে পাই না। বলা বাহুল্য, যে সব নিশাচর প্রাণী রাতে দেখতে পায় তাদের চোখে 'রড' কোষের পরিমাণ খুব বেশী।

*** দুঃখে, শোকে, আনন্দে ও বেদনায় আমাদের চোখে জল আসে কেন?**

চোখে আছে এক ধরনের গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি। তাকে অশ্রুগ্রন্থি বলা হয়। দেহে ও মনে কোনরূপ আঘাত পেলে অথবা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলে আমাদের মস্তিষ্কের কতকগুলো স্নায়ুতে অনুভূতি সৃষ্টি হয়। সেই অনুভূতির প্রভাব এসে পড়ে অশ্রুগ্রন্থিতে। ফলে উত্তেজিত হয় অশ্রুগ্রন্থি এবং গ্রন্থিগুলি থেকে আপনিই জল গড়িয়ে পড়ে।

* চোখের ত্রুটি কাকে বলে? ত্রুটিগুলি কি কি?

বস্তুর প্রতিচ্ছবি যদি অক্ষিপটের উপর পতিত না হয়ে সামনে অথবা পেছনে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাহলেই চোখের ত্রুটি এসে যায়। ত্রুটি প্রধানত দু রকমের। কাছের জিনিসের প্রতিবিম্ব অক্ষিপটের পেছনে গঠিত হলে বলা হয় "দূরদৃষ্টি" এবং দূরের জিনিসের প্রতিবিম্ব অক্ষিপটের সামনে গঠিত হলে বলা হয় "ক্ষীণদৃষ্টি।" প্রথম ত্রুটির ক্ষেত্রে উত্তল লেন্সের চশমা এবং দ্বিতীয় ত্রুটির ক্ষেত্রে অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করা হয়। তখন ঐ লেন্সই দৃশ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব ঠিক অক্ষিপটেই গঠন করতে সাহায্য করে।

অন্যান্য ত্রুটিও আছে। যেমন চালসে, নকুলান্ধতা ইত্যাদি। এ ছাড়া বৃদ্ধ বয়সে চোখের লেন্সের উপর একটা ঘোলাটে আবরণের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

* রাত কানা হয় কেন ?

একেবারে অন্ধকার না হলেও অতি ক্ষীণ আলোতে আমরা কিছুটা দেখতে পাই। তার কারণ, আমাদের চোখের ঐ রড কোষগুলি। ওরাই মৃদু আলোতে উত্তেজিত হয়। কিন্তু কোন কারণে যদি চোখের রড কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে মানুষ রাতকানা হয়ে পড়ে। বিশেষ করে শরীরে ভিটামিন-এর অভাব ঘটলেই রড কোষের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

* আমাদের দুটো চোখের দরকার কেন ?

আমাদের চোখদুটো কিছুটা দূরত্বে আছে। এবং একই বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে উভয় চোখেই পড়ছে। তবে সোজাসুজি না পড়ে সামান্য কোণ করে পতিত হচ্ছে। ঐ কোণ করে পড়ার জন্য যে বস্তুট থেকে আলো আসছে সেই বস্তুটির সঠিক দূরত্ব অনেকটা নির্ধারণ করতে পারি। অর্থাৎ কোন্‌টি কাছের আর কোন্‌টি দূরের সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মে।

* আমরা চোখ রগড়াই কেন ?

চোখে ধূলাবালি পড়লে অবাঞ্ছিত সেই পদার্থগুলোকে নিষ্ক্রান্ত করবার জন্য চোখের গ্রন্থগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং জলের নিঃসরণ ঘটে। কিন্তু অবাঞ্ছিত পদার্থের পরিমাণ যদি বেশী হয় তাহলে তাদের সবগুলিকে বার করে দিতে বেশী পরিমাণ চোখের জল ক্ষরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবে এত জল গ্রন্থিগুলি থেকে নিঃসৃত হতে পারে না। তাই আমরা চোখ রগড়ানোর মাধ্যমে গ্রন্থগুলিকে আরও উত্তেজিত করতে থাকি। যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল নির্গত হয়ে অবাঞ্ছিত পদার্থগুলোকে নিষ্ক্রান্ত করে দেয়।

* চোখের জল কেমন এবং তাতে কোন কোন পদার্থ থাকে ?

চোখের জল লবণাক্ত এবং অল্প জীবাণুনাশক। ওতে জল, সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের লবণ, কিছু কিছু প্রোটিন, কারবোহাইড্রেট ও এনজাইম থাকে।

* চোখের উপর ভ্রূ থাকে কেন ?

চোখ আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই অনেকে ওকে পরশমণি

বলে থাকেন। উক্ত সম্পদটিকে রক্ষার নিমিত্ত হরেক রকমের ব্যবস্থা। চোখে পাতা থাকার জন্য হঠাৎ অবাঞ্ছিত কিছু চোখে পড়তে পারে না এবং আঘাত থেকে রক্ষা করে। গরমের সময় মাথা থেকে ঘাম ঝরে গড়িয়ে আসে চোখের দিকে। সেই ঘামে থাকে ময়লা। ময়লা চোখে পড়লে চোখ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভ্রূ থাকার জন্য ঘামটা ভ্রূর চুলেই আটকা পড়ে। চোখে পড়তে পারে না। ভ্রূ মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে।

*** দুজন মানুষ যদি কিছু সময় একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে তাহলে চোখে জল আসে কেন ?**

কেবল দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকলে নয়, কোন কিছুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে অধিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখে জল আসে। এর কারণ, দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকার ফলে চোখের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং অশ্রুগ্রন্থি থেকে অশ্রু নির্গত হয়।

*** আমরা কোন পদার্থের গন্ধ কিভাবে অনুভব করে থাকি ?**

গন্ধ আমরা অনুভব করি কেন, তা জানার আগে কোন বস্তু থেকে কিভাবে গন্ধ নির্গত হয়—তা জানার দরকার। প্রকৃতপক্ষে সব পদার্থের নিজস্ব কোন গন্ধ থাকে না। আসলে গন্ধ উৎপন্ন হয় সেই বস্তু থেকে—যাদের দেহ থেকে উদ্বায়ী পদার্থগুলো নির্গত হয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার আকারে বাতাসে মিশতে পারে। উদ্বায়ী পদার্থগুলো আবার বিভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন সব ফুল কিংবা সব পাকা ফলের গন্ধ সমান নয়। অপর পক্ষে পচা বস্তু বাতাসে এমন সব উদ্বায়ী পদার্থ ছড়ায়—যার গন্ধ অত্যন্ত অপ্রীতিকর। এগুলি বিষাক্ত উদ্বায়ী বস্তু এবং শরীরের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর।

এখন প্রশ্ন, এগুলি কিভাবে আমরা ঘ্রাণের দ্বারা অনুভব করে থাকি? কেনই বা পৃথক পৃথক বস্তুর পৃথক গন্ধ পাই ?

তার উত্তরে বলা যায়, ঘ্রাণ একরকম রাসায়নিক অনুভূতি। আমাদের ঘ্রাণশক্তির এমনই বৈশিষ্ট্য যে, আমরা চোখে না দেখে কেবলমাত্র আঘ্রাণের দ্বারাই বস্তুকে অনেক সময় সনাক্ত করতে পারি।

তার কারণ, আমাদের মস্তিষ্কে রূপ, গন্ধ, স্বাদ, শব্দ ইত্যাদি অনুভব করার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট আছে। গন্ধকে অনুভব করার জন্য স্থানটিকে বলা হয় ঘ্রাণ কেন্দ্র। আমরা নাক দিয়ে প্রশ্বাসের সঙ্গে বাতাসকে নিয়ে থাকি। যদি কোন উদ্বায়ী পদার্থ সেখানকার বাতাসে মিশে থাকে তাহলে সেই পদার্থগুলো নাকের ছিদ্রপথে প্রবেশ করে। তারপর অলফ্যাক্টরী এপিথেলিয়াম নামক প্যাঁচালো গলিপথ তাদের অতিক্রম করতে হয়। সেই গলিপথে থাকে মিউকাস মেমব্রেন বা মিউকাস পর্দা এবং ঐ পর্দায় থাকে এক ধরনের স্নায়ুকোষ। বাতাসে উদ্বায়ী পদার্থ মিশে থাকলে ঐ স্নায়ুকোষগুলি উত্তেজিত হয়। তারপর স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে সেই উত্তেজনা সঞ্চারিত হয় মস্তিষ্কের ঘ্রাণবোধক অংশে। মস্তিষ্ক তখন তাকে বিশ্লেষণ করে এবং ভাল কি মন্দ—তা নির্দেশ করে। অর্থাৎ ঐখানেই নির্ধারিত হয় কার গন্ধ কেমন! যদি ভাল গন্ধ হয় তাহলে মস্তিষ্ক তাকে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয় এবং খারাপ হলে তারই নির্দেশে আমরা নাক বন্ধ করে থাকি।

*** মুখ দিয়ে বাতাস নিলে আমরা কোন গন্ধ পাইনা কেন?**

মুখ দিয়ে বাতাস নিলে বাতাসে অলফ্যাক্টরী এপিথেলিয়াম এলাকা অর্থাৎ যে এলাকায় ঘ্রাণ স্নায়ু আছে সেই এলাকা অতিক্রম করতে হয় না। তাই এই অবস্থায় মস্তিষ্কে উত্তেজনা সঞ্চারিত হতে পারে না বলে আমরা কোন গন্ধ পাই না।

*** জিভ দিয়ে আমরা কোন বস্তুর কিভাবে স্বাদ গ্রহণ করে থাকি?**

স্বাদও এক রাসায়নিক অনুভূতি। এই অনুভূতি গন্ধ, উষ্ণতা, বস্তুটির রাসায়নিক গুণাবলী ইত্যাদির উপর নির্ভরশীলও।

আমাদের জিভের চারিদিকে ধার ঘেঁষে স্বাদ গ্রহণের জন্য বিশেষ ধরনের কোষ বর্তমান। কোষগুলি এপিলয়েড জাতীয় কোষ। কেবল জিভের পাশগুলিতে নয়, পেছনে, গলবিলে এবং গলবিলের আশেপাশেও এই ধরনের কোষ আছে। কোষগুলির আকার অনেকটা ফুলের কুঁড়ির মত বলে ওকে স্বাদ-কোরক বলা হয়। ঐ স্বাদ-কোরকগুলির মুখে

ছোট ছোট গহ্বর আছে এবং সেই গহ্বরে আছে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র। ছিদ্রের মুখ ভেতরের দিকে খুলতে পারে আবার বন্ধও হতে পারে।

এখানেও রয়েছে এক ধরনের স্নায়ুর মুক্তপ্রান্ত। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বাদ-কোরকগুলির ছিদ্র মুখ উন্মুক্ত হয় এবং উত্তেজিত হয়। সেই উত্তেজনার অনুভূতি জাগে স্নায়ু কোষগুলিতে। তারপর ঐ স্নায়ুর দ্বারা বাহিত হয় মস্তিষ্কে স্বাদবোধক অংশে। আর ঠিক তখনই আমাদের স্বাদের ব্যাপারে অনুভূতি জাগে।

* টক, মিষ্টি, নোনতা ইত্যাদি স্বাদের অনুভূতি জাগে কেমন করে?

জিভের স্বাদ-কোরকগুলির সবাই সমান নয়। বিভিন্ন জিনিসের উপস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য কয়েক জাতীয় স্বাদ-কোরক বর্তমান। মিষ্ট স্বাদ গ্রহণের জন্য যে কোরকগুলি কাজ করে থাকে সেগুলির বেশির ভাগ জিহ্বাগ্রে বর্তমান। আর তাদেরই পাশাপাশি অবস্থান করছে নোনতা স্বাদ গ্রহণের কোরকগুলি। অম্লস্বাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রায় সব রকম কোরক কম বেশী অংশগ্রহণ করে কিন্তু তিক্ত স্বাদ গ্রহণের জন্য জিভের দুপাশে আছে বিশেষ ধরনের কোরক—যাকে পিউকার বলা হয়। অপরদিকে ঝাল এবং ক্ষারের স্বাদ মিশ্র অনুভূতি।

আসলে বিভিন্ন স্বাদ কোরকগুলি উত্তেজিত হয় বিভিন্ন পদার্থের উপস্থিতিতে। শর্করা, অ্যালডিহাইড, কিটোন এবং কিছু কিছু এস্টারের উপস্থিতিতে মিষ্ট স্বাদ গ্রহণকারী কোরকরা উত্তেজিত হয়। সোডিয়াম আয়নের উপস্থিতি নোনতা স্বাদকোরকগুলিকে উত্তেজিত করে। টক স্বাদ গ্রহণের জন্য খাদ্যে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হওয়ার জন্য এ্যাসিড যৌগের প্রয়োজন। অতএব এক এক জাতীয় পদার্থের উপস্থিতি এক এক জাতীয় কোরককে উত্তেজিত করলে তাদের উত্তেজনা জনিত অনুভূতি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয় এবং মস্তিষ্কেই পার্থক্য ধরা পড়ে। তবে মিষ্ট, লবণাক্ত, তিক্ত ও অম্লস্বাদ ছাড়া অপর সমস্ত স্বাদই মস্তিষ্কে মিশ্র অনুভূতি জাগানোর ফল। উক্ত কারণে মানুষের এই ইন্দ্রিয়টি অপরাপর ইন্দ্রিয়ের মত ততখানি উন্নত নয়।

* সর্দি হলে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ জিভে ধরা পড়ে না কেন?

কোন বস্তুর সম্পূর্ণরূপে স্বাদ গ্রহণ করতে হলে সেই বস্তুর গন্ধটাও গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। কেননা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মত জিভটা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। তাই ঘ্রাণ গ্রহণের দরকার হয়ে থাকে। কিন্তু সর্দি হলে নাকের অলফ্যাক্টরী এপিথেলিয়াম এলাকায় সর্দির মিউকাস জমা পড়ে। তাই গন্ধ গ্রহণের জন্য নাকে যে স্নায়ুকোষগুলি বর্তমান সেগুলি উত্তেজিত হতে পারে না। একমাত্র জিভই এক্ষেত্রে কাজ করে বলে খাদ্যবস্তুর স্বাদ আমরা ভালভাবে গ্রহণ করতে পারি না।

* আমরা কেমন করে শুনতে পাই?

কানের দ্বারাই আমরা সব কিছু শুনতে পাই। এই কানের প্রধান তিনটি বিভাগ—বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ। কোন শব্দতরঙ্গ বহিঃকর্ণে প্রবেশ করলে সেটি কর্ণকুহরের মধ্যে কর্ণপটহে গিয়ে আঘাত করে। তখন সৃষ্টি হয় স্পন্দন এবং সেই স্পন্দন মধ্যকর্ণে প্রবেশ করে। মধ্যকর্ণে অবস্থান করছে তিনখানি অস্থি। সেই অস্থিগুলি তখন শব্দতরঙ্গের তীব্রতাকে প্রায় দশগুণে বর্ধিত করে দেয়। অতঃপর সেই তীব্র শব্দতরঙ্গ প্রবেশ করে অন্তঃকর্ণে। সেখানে আছে দুটি নালী। একটিতে পেরিলিম্ফ এবং অপরটিতে আছে এণ্ডোলিম্ফ নামক দুটি তরল ও সান্দ্র পদার্থ। ঐ তরলে শব্দতরঙ্গ প্রবেশ করলে চাপের তারতম্য ঘটে। এণ্ডোলিম্ফ থেকে আছে শ্রবণ-নার্ভ বা শ্রবণের অনুভূতি জাগাবার জন্য এক ধরণের স্নায়ু। ঐ স্নায়ুতে তখন শব্দতরঙ্গের দ্বারা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সেই উত্তেজনা শ্রবণ নার্ভের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয় মস্তিষ্কের শ্রবণ অনুভূতির কেন্দ্রে। আর তখনই আমরা শুনতে পাই।

* গোঁফ-দাড়ি গজায় কেন?

গোঁফ-দাড়ি কেবলমাত্র পুরুষদেরই গজায়। মেয়েদের গজায় না। আবার ছোট ছোট ছেলেদের মুখেও গোঁফ-দাড়ি দেখা যায় না। গোঁফ-দাড়ির মূলে আছে একরকম উত্তেজক রস। তার নাম

টেস্টোস্টেরণ। বয়স বাড়লে পুং জননগ্রন্থি টেস্টিস্ থেকেই উক্ত উত্তেজক রসের ক্ষরণ ঘটে। মেয়েদের এবং ছোট ছেলেদের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরণ ক্ষরিত হয় না বলে তাদের গোঁফ-দাড়ি গজায় না।

* শীতকালে আমাদের ঠোঁট ফাটে কেন?

শীতকালে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব কম থাকে। উক্ত কারণে জলের বাষ্পীভবন বেশ দ্রুত হয়। তার প্রমাণ, বর্ষাকাল অপেক্ষা শীতকালে ভিজে কাপড়-চোপড় বেশ তাড়াতাড়ি শুকোয়।

দেখা গেছে, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যত কম হয় ততই বাষ্পীভবনের হার হয় দ্রুত। অর্থাৎ বাতাস তখন তার জলীয় বাষ্পের ঘাটতি পূরণ করতে চায় চারপাশের জলের উৎস থেকে। মানুষের দেহে জলের পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। শীতকালে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব কমে যায় তখন আমাদের শরীর থেকেও জল বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে যেতে চায়। তাই কেবল ঠোঁট নয় শরীরের অন্যান্য অংশও ফেটে যেতে পারে। তবে দেহের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ঠোঁটের চামড়া যথেষ্ট পাতলা এবং মুখগহ্বর সব সময় যথেষ্ট ভিজা থাকে। তাই অনেক সময় ঠোঁটের কিনারা অভ্যাস বশে একটু ভেতরে পুরলেই সিক্ত হয়ে ওঠে। উক্ত কারণে দেহস্থ জলের বাষ্পীভবনের সুবিধা বেশী এবং ঠোঁটের চামড়া খুব পাতলা বলে ফাটেও বেশী।

বছরের অন্যান্য ঋতুতে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী থাকায় বাষ্পায়ণের হার বেশ মন্থর। সেই কারণে শরীরের চামড়া কিংবা ঠোঁট আদৌ ফাটে না।

* মানুষ শীতে কাঁপে কেন?

মানুষ উষ্ণশোণিত বিশিষ্ট জীব। তার শরীরে তাপ উৎপন্ন হয় বিপাকীয় কর্মের জন্য এবং এই বিপাকের হার নির্ভর করে পরিশ্রমের উপর। ফলে মানবদেহে স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮° ফারেনহাইটে বজায় থাকে।

অত্যধিক শীত পড়লে বাইরের তাপমাত্রা বেশ কমে যায়।

তখন আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রা থেকে অনেক বেশী থাকে। তাপমাত্রার এইভাবে বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার ফলে উচ্চ তাপমাত্রাযুক্ত মানব শরীর তাপমাত্রা ধরে রাখতে অসমর্থ হয়। অথচ শরীর চায় তার স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখতে। তখন বাধ্য হয়ে তাপমাত্রা বজায় রাখার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অর্থাৎ কাঁপতে থাকে। কাঁপার আসল কারণ, উক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বনের দ্বারা সে বিপাকীয় কর্মের হার বাড়িয়ে দিয়ে বেশী পরিমাণ তাপ উৎপাদন করতে প্রবৃত্ত হয়। তাই শীতে কিছুক্ষণ কাঁপার পর কম্পন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ চলতে পারে না। পুনরায় দেহের তাপমাত্রা কমবে এবং শরীরও পুনরায় কাঁপতে আরম্ভ করবে।

* বিপাক কাকে বলে ?

দেহকোষে সব সময় নানাধরণের রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। পরিবর্তনগুলোকে একসঙ্গে বলা হয় বিপাক।

* চুল কাটলে ব্যথা লাগে না কেন ?

চুলে কোন স্নায়ু নেই। যেহেতু যে কোন অনুভূতির একমাত্র কারণ স্নায়ু, সেই কারণে চুল কাটলে কোন ব্যথা লাগে না।

* স্নায়ু ও স্নায়ুতন্ত্র কি ?

স্নায়ু একজাতীয় কলা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এদের মাধ্যমেই আমাদের দেহের সমস্ত কাজকর্ম সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আমাদের মাথার খুলির মধ্যে অতি যত্নে এবং অতি সাবধানে ঘিলু বা মগজ রক্ষিত। সেই মগজ থেকে নেমেছে সুষুম্নাকাণ্ড। শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে নেমে একেবারে পিঠের শেষভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর সেখান থেকে সরু সরু সূতার মত অসংখ্য নার্ভ বা স্নায়ু বিভিন্ন স্থান থেকে বেরিয়ে দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রান্তদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এরাই বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে অর্থাৎ যে কোন উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারপর সেই উত্তেজনাকে সঞ্চার করে মস্তিষ্কে। আর ঠিক তখনই মস্তিষ্কে অনুভূতি জাগে। এরা যেন তারের মত সারা দেহটাকে ঘিরে ফেলেছে

এবং হেড অফিস তথা মস্তিষ্কে মুহূর্তের মধ্যে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছে।

বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য কলারাই গঠন করে তন্ত্র। যে তন্ত্রের মাধ্যমে শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, স্বাদ ইত্যাদি গ্রহণ ; গরম, ঠাণ্ডা, ব্যথা, বেদনা প্রভৃতি অনুভব ; সুখ, দুঃখ ইত্যাদি বোধ এবং জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা প্রভৃতি যে কলাতন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকেই স্নায়ুতন্ত্র বলে।

মানুষের মস্তিষ্ক থেকে ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ু এবং সুষুম্না শীর্ষক থেকে নেমেছে ৩১ জোড়া সুষুম্না স্নায়ু। করোটিক স্নায়ু চোখ, কান, জিভ, নাক ইত্যাদি থেকে খবর সংগ্রহ করে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয় এবং সুষুম্না স্নায়ু দেহত্বকের প্রায় সব অঞ্চল থেকে খবর আনে এবং মস্তিষ্কের নির্দেশ বহন করে মাংস পেশীদের কাছে।

* স্নায়ু কত রকমের এবং কি কি ? তাদের কাজই বা কি কি ?

স্নায়ু দু রকমের। ঐচ্ছিক স্নায়ু ও অনৈচ্ছিক স্নায়ু। ঐচ্ছিক স্নায়ুর দ্বারা আমাদের নিজেদের ইচ্ছামত কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন কোন কিছু শোনা, দেখা, স্বাদগ্রহণ করা, স্পর্শ অনুভব করা ইত্যাদি। আর যে সব স্নায়ু আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা রাখে না তারাই অনৈচ্ছিক স্নায়ু। ঘুমিয়ে পড়লে অথবা বিশ্রাম গ্রহণ করলে ঐচ্ছিক স্নায়ুরা বিশ্রাম করে কিন্তু অনৈচ্ছিক স্নায়ুরা বিশ্রাম করে না। ওদের বিশ্রাম অর্থে চিরনিদ্রা। হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদির স্নায়ুই অনৈচ্ছিক স্নায়ু।

* নিউরন কি ?

নার্ভতন্ত্রের একক।

* বৃদ্ধ বয়সে মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে কেন ?

বেশী বয়স হলে মস্তিষ্কে নিউরোনরা মারা যেতে আরম্ভ করে।

* আমাদের হেড অফিস অর্থাৎ মস্তিষ্কটা কেমন ?

আমাদের মাথার খুলিটা যদি তুলে ফেলা যায় তাহলে দেখা যাবে কতকগুলো এবড়ো থেবড়ো ও আঁকাবাঁকা বস্তু। বাইরে থেকে বেশ কোঁচকানো এবং ধূসর দেখায়। এগুলোর সবটাই কয়েক কোটি

স্নায়ুকোষ এবং সেই সব স্নায়ুকোষের সংযোগকারী স্নায়ুতন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। তিনটি বিশেষ পর্দা দিয়ে এরা ঢাকা থাকে। সবচেয়ে নিচের পর্দাটা এদের এমন দৃঢ়ভাবে আটকে রেখেছে যে বাইরে থেকে কোন আঘাতে আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। এদের সম্মিলিত নাম সেরিব্রাল কর্টেক্স

সেরিব্রাল কর্টেক্সটা মাথার সিঁথি বরাবর সোজা ডান ও বাম দিকে দুটি ভাগে বিভক্ত। ডান দিকের অংশটাকে বলা হয় ডান হেমিস্ফিয়ার ও বাম দিকের অংশটিকে বলা হয় বাম হেমিস্ফিয়ার। দুটি হেমিস্ফিয়ারই উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে।

সেরিব্রাল কর্টেক্স প্রধান চার ভাগে বিভক্ত। উপরের অংশটা অগ্রমস্তিষ্ক, তার পরের অংশ অর্থাৎ মধ্যস্থলের অংশ মধ্যমস্তিষ্ক বা প্যারাইট্যাল, মধ্য মস্তিষ্কের পেছনের অংশ বা অক্সিপিট্যাল এবং চতুর্থ বিভাগটি কানের মধ্যস্থল থেকে ঠিক চার মিলিমিটার উপর পর্যন্ত। ওদের আবার উপবিভাগও আছে। যেমন অগ্র মস্তিষ্কের দুটি উপবিভাগ গুরু মস্তিষ্ক ও ডায়েন কেলাসন, মধ্য মস্তিষ্কের বা প্যারাইট্যালের দুটি উপবিভাগ করপোরা কোয়াড্রিজেমিনা ও ক্রুরা সেরিব্রি, পশ্চাৎ মস্তিষ্কের লঘু মস্তিষ্ক ও মেডুলা অবলংগটা ইত্যাদি। তবে বেশী অংশ জুড়ে গুরু মস্তিষ্কের অবস্থান এবং উক্ত অংশেরই ওজন বেশী। আর তৃতীয় বিভাগের উপরিভাগ মেডুলা অবলংগটা থেকে সুষুম্নাকাণ্ড বেরিয়ে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে পিঠ পর্যন্ত বিস্তৃত। সুষুম্না কাণ্ড থেকে আবার ৩১ জোড়া স্নায়ু উৎপন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেহের সর্বত্র। তাই দেহের যে কোন অঞ্চল থেকে খবর সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয় না স্নায়ুদের।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ যে সব কাজ পরিচালনা করে থাকে সেই অংশেরও এক একটা নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। প্রথম দিকে বিজ্ঞানী ক্যাম্বেল ২০ ভাগে ভাগ করেছিলেন। তাঁর পরে ব্রডম্যান নামে আর একজন বিজ্ঞানী ভাগ করেছিলেন ৪৭ ভাগে। ব্রডম্যানের পরে আরও বিভাগ করেছেন অনেকে।

পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ। যেমন দেখা কাজটা সম্পন্ন হয় দৃষ্টি বোধক অংশে, স্বাদ গ্রহণ করি স্বাদ অনুভূতির অংশে, ঘ্রাণ গ্রহণ করি ঘ্রাণ-বোধক অংশে, শ্রবণ করি শ্রবণ অনুভূতির অংশে; এমন কি আমাদের কথা বলার জন্যও মস্তিষ্কে বিশেষ অনুভূতির অংশ বিদ্যমান।

শরীরের আরও নানাপ্রকার কার্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও কত অংশ আছে। সেগুলি কাজের গুরুত্ব হিসাবে পর পর সাজানো থাকে। যাদের কাজের গুরুত্ব বেশী তারা থাকে উপরের দিকে। তবে যত অংশ বিদ্যমান থাকুক না কেন ওদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আছে অর্থাৎ একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আর ওদের সমবেত কাজটাই হচ্ছে একজন মানুষের বুদ্ধি, বিবেক ও বিচার ক্ষমতা।

* মস্তিষ্কের ওজন ও ক্ষেত্রফল কত?

মস্তিষ্কের ওজন পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রায় ১৩৫০ গ্রাম ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ১১৫০ গ্রাম। ক্ষেত্রফলটা ২২০,০০০ বর্গ মিলিমিটার। তবে ওজন বলতে গুরু মস্তিষ্কের ওজনটাই প্রধান। কারণ, মস্তিষ্কের পাঁচ ভাগের চার ভাগ স্থান জুড়ে এটির অবস্থান।

* মস্তিষ্কের স্নায়ুর সংখ্যা কত?

প্রায় ২০০ মিলিয়ন।

* মানুষের উন্নত মস্তিষ্কের জন্য দায়ী কে?

সেরিব্রাল কর্টেক্স।

* পেশী কি এবং কাকে বলে?

চামড়ার তলায় এবং হাড়ের গায়ে যে মাংস থাকে তাকেই বলা হয় পেশী। কোষ সমষ্টির যে কলা পেশী গঠন করেছে তাকে বলা হয় পেশীকলা। সরু ও লম্বা লম্বা কতকগুলো রবারের টুকরাকে একত্রিত করলে যেমনটি দেখায়, মাংস-পেশীও অনেকটা তেমনই। এর মাঝখানটা মোটা এবং দুদিকটা সরু। সরু প্রান্তগুলি হাড়ের সঙ্গে জুড়ে থাকে। দেহের ওজনের মোট ৪০ থেকে ৫০ ভাগ পেশী।

* কণ্ডরা কাকে বলে ?

সাধারণত দড়ির মত যে সব কলা পেশীগুচ্ছকে অস্থির সঙ্গে আটকে রাখে, তাকেই বলা হয় কণ্ডরা।

* পেশী কয় প্রকারের এবং কি কি? শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে কি ধরণের পেশী থাকে ?

মানবদেহের পেশী প্রধানত তিন রকমের। ঐচ্ছিক পেশী, অনৈচ্ছিক পেশী এবং হৃৎপেশী।

পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্রাশয় প্রভৃতি স্থানে থাকে অনৈচ্ছিক পেশী এবং হৃৎপিণ্ডে থাকে হৃৎপেশী। এই দুই ধরণের পেশীর নিয়ন্ত্রণ মানুষের ইচ্ছানুসারে হয় না। অতএব হৃৎপেশীও অনৈচ্ছিক পেশী।

অনৈচ্ছিক পেশী ছাড়া সারা শরীরে আর যে সব পেশী বিদ্যমান, তারা সবাই ঐচ্ছিক পেশী। এই পেশীগুলির নিয়ন্ত্রণ মানুষের ইচ্ছানুসারে হয় বলে অনুরূপ নামকরণ।

* মানবদেহে কয়খানি হাড় আছে ?

পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে হাড়ের সংখ্যা ২০৬। কিন্তু শৈশবাবস্থায় হাড়ের সংখ্যা থাকে ২৭০ খানি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু হাড় জোড়া লেগে যায়। ফলে হাড়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৬ খানি। প্রকৃতপক্ষে মানবদেহের কাঠামো বা কঙ্কাল ২০৬ খানি হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত।

* দেহের কোথায় কতখানি হাড় থাকে ?

মাথার খুলিতে ২৯টি, মেরুদণ্ডে ২৬টি কশেরুকা, দু কাঁধের নিচে ২টি অংশফলক বা অক্ষক, কাঁধের নিচে পিঠের দিকে ১টি অংশফলক দু হাতে ৩০টি করে মোট ৬০টি, উরু ফলক ২টি, দুই পায়ে ৩১টি করে মোট ৬২টি এবং বুকের পাঁজরে থাকে ১২ জোড়া বা ২৪টি হাড়।

* হাড়ের কাজ কি ?

হাড়ের কাঠামো দিয়ে দেহটা তৈরি বলে দেহের একটা নির্দিষ্ট আকার আছে। আর ঐ হাড়ের কাঠামো থাকার জন্যই আমরা ইচ্ছামত চলাফেরা এবং কাজকর্ম করতে পারি। তাছাড়া মস্তিষ্ক, ফুসফুস,

হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি দেহের অতি প্রয়োজনীয় অংশগুলিকে হাড় ঘিরে রাখে এবং আঘাত থেকে রক্ষা করে। বলাবাহুল্য, খণ্ড খণ্ড হাড় দিয়ে যদি দেহের কাঠামো গঠিত না হত তাহলে আমরা ইচ্ছামত চলাফেরা, কাজকর্ম, খাওয়া, বসা, ঘুমানো ইত্যাদি কিছুই করতে পারতাম না।

* হাড় কি দিয়ে তৈরী? এটি ইট, পাথরের মত কি নিষ্প্রাণ?

হাড় ক্যালসিয়াম ফসফেট এবং অন্যান্য অজৈব লবণের কোলাস দিয়ে তৈরী।

আসলে হাড় প্রাণহীন নয়। প্রাণময় সূক্ষ্ম তন্তু দিয়ে গঠিত। তন্তুগুলোর মধ্যে কিছু কিছুর আবরণ থাকে এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট থাকায় আবরণগুলিকে শক্ত করে রাখে। এরা একরকম কলা দিয়ে গঠিত।

হাড়ের তন্তুগুলি আবার পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থান করে না। এরা যুক্ত অবস্থায় থাকে এবং এদের মধ্যে রক্তবাহী শিরা আছে। আর আছে স্নায়ু।

* দেহের অস্থিগুলি কত প্রকারের এবং কি কি?

মানবদেহের কাঠামোটি যে ২০৬ খানি হাড় দিয়ে গঠিত সেই সমস্ত হাড় মিলে যে তন্ত্র তাকে বলা হয় অস্থিতন্ত্র। অস্থিগুলির আকার সবার সমান নয়। আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য ওদের প্রধান ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) ক্ষুদ্রাস্থি (২) দীর্ঘাস্থি (৩) চ্যাপ্টা অস্থি এবং (৪) অনিয়মিত অস্থি।

দেহের যে সব জায়গায় অধিকতর বল প্রযুক্ত হয় সে সব জায়গায় কঙ্কাল ক্ষুদ্রাস্থি দিয়ে গঠিত। ক্ষুদ্রাস্থি আকারে ছোট হলে কি হবে ওরা অত্যন্ত দৃঢ় এবং চাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে।

দেহের হাত পা দীর্ঘাস্থি দিয়ে গঠিত। দীর্ঘাস্থি অনেকটা নলের মত কিন্তু প্রান্তদেশ স্ফীত। নলের মত অংশের ভেতরটা ফাঁপা এবং ফাঁপা অংশের মধ্যে থাকে মজ্জা।

চ্যাপ্টা অস্থিগুলি দেহের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সংযোগ রক্ষা করে এবং এই জাতীয় অস্থি দেখতে চাকতির মত। চ্যাপ্টা

অস্থির সঙ্গে অধিক মাংসপেশী সংযুক্ত থাকে।

উপরোক্ত তিন ধরণের অস্থি ছাড়া অন্যান্য অস্থিকে অনিয়মিত অস্থি বলে। এরা আকৃতিতে সবাই পৃথক। একটির সঙ্গে আর একটির আদৌ মিল নেই। তাই এমন নামকরণ।

* তরুণাস্থি কাকে বলে?

দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগস্থলে একরকম পদার্থ থাকে —যা অস্থিগুলির নাড়াচাড়া সীমাবদ্ধ রাখে। উক্ত পদার্থকে বলা হয় তরুণাস্থি।

* রক্ত কি এবং তাতে কোন্ কোন্ বস্তু বিদ্যমান?

রক্ত এক রকমের যোগকলা। দেহের সমস্ত অংশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। এটি তরল পদার্থ হলেও এতে তিন রকমের কণিকা বিদ্যমান। কণিকাগুলির নাম লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অনুচক্রিকা। ঐ তিন কণিকা ছাড়াও রক্তের আর একটি উপাদান-রক্তরস।

* রক্তের কাজ কি?

রক্ত দেহের যে সব কাজ সম্পন্ন করে থাকে তাদের মধ্যে প্রধান দুটি কাজ হল ( ) খাদ্যের সারাংশকে বিভিন্ন কোষে পৌছে দেয় এবং কোষ থেকে দূষিত পদার্থকে বার করে নিয়ে আসে। এমনকি মরা কোষকেও বহন করে আনে। (২) শ্বাসকার্যে সহায়তা করে এবং অক্সিজেনকে ফুসফুস থেকে প্রতিটি কোষে পৌছে দেয়। অপরদিকে কোষ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডকে ফুসফুসে নিয়ে আসে।

* লোহিত কণিকা কি এবং তার কাজই বা কি?

লোহিত কণিকা দেখতে গোলাকার, অনেকটা চাকতির মত। ওর ব্যাস ০'০০৭ মিলিমিটার এবং ০'০০২ মিলিমিটার পুরু। এরা কোষ বটে কিন্তু নিউক্লিয়াস নেই। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে রক্তের পরিমাণ প্রায় তিন লিটারের মত। অথচ প্রতি ঘন মিলিলিটারে লোহিত কনিকার সংখ্যা ৫০ লক্ষের মত। তুলনা-

মূলকভাবে স্ত্রীলোকের রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা একটু কম থাকে। অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিলিটারে থাকে ৪৫ লক্ষের মত। এরাই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অক্সিজেন প্রভৃতিকে বহন করে নিয়ে যায়।

শরীরে যত লোহিত কণিকা থাকে তত ভাল। শরীরে রক্ত-ক্ষরণ, অপুষ্টি, অসুস্থতা প্রভৃতির জন্য লোহিত কণিকার ঘাটতি ঘটে। এর অভাবে শরীর দুর্বল ও অবসন্ন হয়। রক্তহীনতা বলতে দেহে লোহিত কণিকার অভাবকে বুঝায়।

লোহিত কণিকার মধ্যে থাকে হিমোগ্লোবিন নামে একরকম লৌহগঠিত জটিল রাসায়নিক পদার্থ। উক্ত কারণে রক্তের রঙ লাল।

* **হিমোগ্লোবিনের উপাদান ও কাজ কি?**

রক্তের লোহিত কণিকার প্রধান অংশ হিমোগ্লোবিন। কণিকা-গুলি গোলাকার এবং অত্যন্ত নমনীয় এক ধরণের কোষ। এরা লোহিত কণিকার মধ্যে একটি প্রোটিনের জালিকার মধ্যে অবস্থান করে, কদাচ বাইরে বেরিয়ে আসে না।

হিমোগ্লোবিন একটি ধাতব মিশ্র প্রোটিন। তার এক অংশ "হিম" এবং অপর অংশ "গ্লোবিন"। হিম অংশে থাকে শতকরা ৪ ভাগ বাকি ৯৬ ভাগ গ্লোবিন। হিমটি ধাতব যৌগিক পদার্থ। কেন্দ্রে থাকে একটি লোহার পরমাণু এবং তাকে ঘিরে রেখেছে প্রোটোপর-ফাইরিন কাঠামো। প্রকৃতপক্ষে ঐ লৌহ পরমাণুর অস্তিত্বের জন্য রক্ত লাল।

গ্লোবিনের কিন্তু কোন রঙ নেই। এটি দুটি পলিপেপ্টাইড শৃঙ্খলে আবদ্ধ। প্রতিটি পলিপেপ্টাইড চেনে থাকে ১৫০ রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড।

প্রকৃতপক্ষে হিমোগ্লোবিনই শ্বাসক্রিয়ায় সাহায্য করে থাকে। এরাই অক্সিজেনকে দেহের প্রতিটি কোষ ও তন্তুতে বহন করে নিয়ে যায়। এদের বৈশিষ্ট্য হল, অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসা মাত্রই অক্সি-হিমোগ্লোবিনে পরিণত হয়। কোষে গেলেই অঙ্গচ্যুত হয় অক্সিজেন। কার্বন ডাই-অক্সাইডকেও বহিষ্কার করে উক্ত হিমোগ্লোবিন।

মানব দেহে সব হিমোগ্লোবিন সমান নয়। প্রকার ভেদ আছে। শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তার রক্তে যে হিমোগ্লোবিন থাকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পরিবর্তিত হয়। তবে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও প্রথম দিকের কিছু কিছু হিমোগ্লোবিন থাকে। শিশুর হিমোগ্লোবিনকে হিমোগ্লোবিন— এবং প্রাপ্তবয়স্কদের হিমোগ্লোবিনকে হিমোগ্লোবিন—২ বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের শরীরে হিমোগ্লোবিন—১-এর আধিক্য রোগের লক্ষণ।

* শ্বেতকণিকা কেমন এবং তার কাজ কি?

শ্বেতকণিকা লোহিত কণিকা অপেক্ষা আকারে বড়। এতে নিউক্লিয়াস আছে কিন্তু হিমোগ্লোবিন নেই। এরা কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে এবং প্রতি সাতশ' লোহিত-কণিকার সঙ্গে থাকে মাত্র একটি শ্বেতকণিকা।

শ্বেতকণিকাদের দেহরক্ষী বলা যেতে পারে। কারণ, বাইরে থেকে রোগ জীবাণুরা দেহে প্রবেশ করলে এরাই প্রতিরোধ করে।

* পূঁজ কি?

শরীরে জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটলে রক্তের শ্বেতকণিকা তাদের প্রতিরোধ করার জন্য অ্যান্টিবডি তৈরী করে। এই অবস্থায় কিছু কিছু শ্বেতকণিকা বিনষ্ট হয়, অপর দিকে বিনষ্ট হয় স্থানীয় কিছু কিছু কোষ সমষ্টি বা ময়লা। মৃত শ্বেতকণিকা, মৃত জীবাণু, ক্ষতিগ্রস্ত কোষ মধ্যস্থিত প্লাজমা ইত্যাদি সব মিলেই পূঁজ।

* শরীরে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা কি?

সাধারণত শরীরে বিষাক্ত কোন কিছু অথবা রোগজীবাণু প্রবেশ করলে রক্তে প্রতিরোধকারী এক ধরণের শ্বেত কণিকা ও এক জাতীয় প্রোটিন অণুর উদ্ভব হয়। ঐ শ্বেতকণিকার নাম লিমফোসাইটিস এবং প্রোটিন অণুটির নাম অ্যান্টিবডি। পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে, রোগজীবাণু ও অ্যান্টিবডি পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিক্রিয়া করে এবং উভয়েই প্রশমিত হয়ে যায়।

অ্যান্টিবডি তৈরী করার ক্ষমতা সব দেহের সমান নয়। আবার

যে কোন রোগজীবাণুর জন্য দেহে একই ধরণের অ্যান্টিবডি তৈরী হয় না। অর্থাৎ বিভিন্ন রোগজীবাণুকে প্রশমিত করতে বিভিন্ন অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করে শরীর। অ্যান্টিবডি তৈরির ব্যাপারটা কোষ মধ্যস্থিত এক ধরণের জিনের উপর নির্ভরশীল। এই জিন আবার পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। কোষে উক্ত জিনের অভাব থাকলে রক্তে উপযুক্ত অ্যান্টিবডি তৈরী হতে পারে না। তাই কেউ সব সময় রোগ ভোগ করে আবার কেউ বা রোগ ভোগ কম করে থাকে।

* অনুচক্রিকা কেমন এবং তার বৈশিষ্ট্য কি?

রক্তে অবস্থানকারী লোহিত কণিকা ও শ্বেতকণিকা অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট, নিউক্লিয়াস বিহীন, বর্ণহীন এক জাতীয় কণিকা। আকারে গোল। প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষ অনুচক্রিকা থাকে। এদের গড় পরমায়ু মাত্র চারদিন। এরা অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়। কোথাও কেটে গেলে ক্ষতস্থানে রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। ফলে কিছুক্ষণ পরে ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ আপনা হতে বন্ধ হয়ে যায়।

* রক্তরসের উপাদান কি এবং তার কাজই বা কি?

রক্তরস ঈষৎ হরিদ্রাভ ক্ষারধর্মী পদার্থ। তার শতকরা ৯০ ভাগ জল। অবশিষ্ট সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস প্রভৃতির লবন, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসীয় পদার্থ বিদ্যমান। অন্যান্যদের মধ্যে থাকে ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, নানা রকম উৎসেচক বা এনজাইম, বিষঘ্ন বা অ্যান্টিবডি, অ্যামিনো অ্যাসিড প্রভৃতি।

রক্তরস বিভিন্ন পদার্থকে বহন করে থাকে এবং রক্তের চাপ বজায় রাখে।

* কোথাও কেটে বা ছিঁড়ে গেলে কিছুক্ষণ পরে আপনা-আপনি রক্ত পড়া বন্ধ হয় কেন?

শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে রক্ত বাইরে বেরিয়ে আসে

এবং তখনই সেখানকার অনুচক্রিকাগুলি ভেঙে যায়। ভেঙে যাওয়ার ফলে অনুচক্রিকা থেকে থ্রম্বোপ্লাস্টিন নামে একরকম পদার্থ গঠিত হয়। তারপর ক্যালসিয়াম আয়নের সাহায্যে রক্তরসের প্রোটিনের একটি উপাদান প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে রূপান্তরিত করে। পরে ঐ থ্রম্বিন রক্তরসে প্রোটিনের আর একটি উপাদান ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে পরিণত করে। ফাইব্রিন তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনা-আপনি জমাট বাঁধে।

*** শুদ্ধরক্ত ও দূষিত রক্ত কাকে বলে ?**

রক্তে অক্সিজেন থাকলে বলা হয় শুদ্ধরক্ত এবং কার্বন ডাই অক্সাইড থাকলে বলা হয় দূষিত রক্ত।

*** রক্তচাপ কি এবং সিস্টোলীয় ও ডায়াস্টোলীয় রক্তচাপ কাকে বলে ?**

রক্তবাহী নল বা ধমনীর দ্বারা রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রবাহিত হয় এবং মহাশিরার মাধ্যমে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। রক্ত যেহেতু তরল পদার্থ, তাই ধমনীর ভেতরে রক্ত পাশের দিকে যে চাপ প্রদান করে তাকেই বলা হয় রক্তচাপ।

হৃৎপিণ্ড সঙ্কোচনের সময় রক্তের চাপ বেশী হয় এবং প্রসারণের সময় রক্তের চাপ হয় সবচেয়ে কম। সঙ্কোচনের সময় সর্বোচ্চ মানের যে রক্তের চাপ পাওয়া যায় তাকে বলে সিস্টোলীয় চাপ এবং প্রসারণের সময় সর্ব নিম্নমানের যে চাপ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ডায়াস্টোলীয় চাপ।

*** রক্তের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম কি এবং একজন যুবকের দেহের স্বাভাবিক রক্তচাপ কত ?**

রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম স্পিগ্‌মোম্যানোমিটার। একজন যুবকের ক্ষেত্রে সিস্টোলীয় এবং ডায়াস্টোলীয় চাপের মাপ যথাক্রমে ১২০ মিলিমিটার ও ৮০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভের সমান।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের চাপ বাড়ে। অতিরিক্ত রক্তচাপ অথবা কম রক্তচাপ শরীরের পক্ষে বিপদের কারণ।

* সবার দেহের রক্ত কি সমান ?

না, এক আধটু তফাৎ আছে। তাই কোন রোগীর দেহে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হলে যে কেউ রক্ত দিতে পারে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা রক্তের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। বিভাগগুলি যথাক্রমে A, B, AB এবং O। রক্তদানের আগে রক্তকে পরীক্ষা করা হয় এবং কোন্ বিভাগের তাও নির্ণয় করতে হয়। বলা বাহুল্য, রোগীর দেহের রক্তেরও শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। দেখা গেছে, রোগীর দেহের যে শ্রেণীর রক্তের প্রয়োজন সেই শ্রেণীর রক্ত না দিয়ে অন্য শ্রেণীর রক্ত দিলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

* কৃত্রিমভাবে কি রক্ত তৈরি সম্ভব ?

হ্যাঁ, বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে রক্ত তৈরি সম্ভব হয়েছে। প্রথমে ক্লোরিন এবং কার্বন নামক দুটি মৌলিক পদার্থের সহযোগে ক্লোরোকার্বন নামে একরকম যৌগিক পদার্থ তৈরি করা হয়। তৎপরে উক্ত যৌগিক পদার্থটির সঙ্গে মিশ্রিত করা হয় জল ও গ্লুকোজ। সবশেষে ঐ মিশ্রণটির ভেতর দিয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গ বা আলট্রাসনিক ওয়েভ পাঠান হয়। তখন মিশ্রণের ক্লোরোকার্বন ভেঙে যায় এবং তৈরী হয় রক্ত।

* কৃত্রিম রক্ত রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয় কি ?

কৃত্রিম রক্তকে সরাসরি রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয় না তার সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেনকে মিশ্রিত করা হয় এবং তখনই সেটি প্রবেশ করানোর উপযোগী হয়।

কৃত্রিম রক্তের একটি সুবিধা আছে। উক্ত রক্তের কোন শ্রেণী নেই। যে কোন রোগীর দেহে কৃত্রিম রক্তকে দেওয়া যেতে পারে।

* হৃৎপিণ্ড কি ?

সারাদেহে রক্ত সরবরাহের যন্ত্র বিশেষ। এটিকে একটি পাম্প যন্ত্রের সঙ্গেও তুলনা করা যেতে পারে। কারণ, এটি একবার সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং পরক্ষণে প্রসারিত হচ্ছে।

হৃৎপিণ্ড বুকের প্রায় মাঝখানে থাকে এবং একটি পর্দা দিয়ে ঢাকা।

তার দুপাশে আছে দুটি ফুসফুস। হৃৎপিণ্ডের দুটি বিভাগ। ডানদিকের বিভাগ ও বামদিকের বিভাগ। বিভাগ দুটি একটি পর্দার দ্বারা বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ সরাসরি রক্ত প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা নেই।

বিভাগ দুটির প্রত্যেকটির আবার দুটি করে উপবিভাগ আছে। উপরে ও নিচের উপবিভাগ দুটির মাঝখানে থাকে ভাল্ব বা কপাটিকা। ঐ ভাল্ব থাকার জন্য উপর থেকে রক্ত নিচের দিকে নামতে পারে কিন্তু নিচের রক্ত উপরে উঠতে পারে না। বিভাগ দুটির প্রত্যেকের উপরের উপবিভাগগুলিকে বলা হয় অলিন্দ এবং নিচের উপবিভাগ দুটিকে বলা হয় নিলয়। ডানদিকের অলিন্দকে ডান অলিন্দ ও বামদিকের অলিন্দকে বলা হয় বাম অলিন্দ। তেমনই ডানদিকের ও বামদিকের নিলয় যথাক্রমে ডান নিলয় ও বাম নিলয়। প্রত্যেকটি অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যে থাকে ভাল্ব।

* শরীরের রক্ত সংবহন সম্বন্ধে প্রথমে কে বৈজ্ঞানিক মতবাদ রাখেন?

উইলিয়ম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭)।

* কেমন করে শরীরে রক্ত সংবহন হয়?

রক্ত সংবহনের মূলযন্ত্র হৃৎপিণ্ড। অনৈচ্ছিক পেশীর দ্বারা গঠিত এটি একবার সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং আবার প্রসারিত হচ্ছে। অবশ্য সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে অলিন্দ নিলয়গুলি। প্রায় একই সঙ্গে দুটি অলিন্দ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় এবং একই সঙ্গে হয় নিলয় দুটিও। তবে অলিন্দের সঙ্কোচনের পরই নিলয়ের সঙ্কোচন আরম্ভ হয়।

যখন প্রসারিত হয়, তখন শরীরের উপরিভাগের দূষিত রক্ত উত্তম মহাশিরা দিয়ে নিম্নভাগের দূষিত রক্ত নিম্ন মহাশিরা দিয়ে এবং হৃৎপিণ্ডের দূষিত রক্ত চক্রীয় শিরানাল দিয়ে ডান অলিন্দে প্রবেশ করছে। পরবর্তী পর্যায়ে এখানকার সঙ্কোচন আরম্ভ হলেই রক্ত তিন পাল্লাযুক্ত কপাটিকা দিয়ে ডান নিলয়ে যাচ্ছে। ডান নিলয়ের সঙ্কোচন হলে দূষিত রক্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা দিয়ে ফুসফুসীয় ধমণী দ্বারা প্রবেশ করছে দুই ফুসফুসে। সেখানে কার্বন ডাই অক্সাইডকে বর্জন ও

অক্সিজেনকে গ্রহণ করে অর্থাৎ বিশুদ্ধ হয়ে চারটি ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে প্রবেশ করছে বাম অলিন্দে। বাম অলিন্দ সঙ্কুচিত হলে দুটি পাল্লাযুক্ত কপাটিকা ভেদ করে রক্ত চলে আসে বাম নিলয়ে। তারপর মহাধমণীর দ্বারা বাহিত হয়ে শিরা-উপশিরার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে।

সাধারণত ধমণী বিশুদ্ধ রক্ত ও শিরা দূষিত রক্ত বহন করে। কিন্তু ফুসফুসীয় ধমণী দূষিত রক্ত এবং ফুসফুসীয় শিরা বিশুদ্ধ রক্তকে বহন করে।

*** হৃৎপিণ্ড কি কখনও থামে ?**

না, মৃত্যুর পূর্বে থামে না।

*** ধমণী ও শিরার পার্থক্য কি ?**

ধমণী দিয়ে শুদ্ধ রক্ত ও শিরা দিয়ে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয়। উভয়ের আকৃতি ফাঁপা নলের ন্যায়। তবে ধমণী অপেক্ষা শিরা সরু।

*** নাড়ীর স্পন্দন কেন হয় ?**

নাড়ী হাতের কব্জিতে অবস্থিত রেডিয়্যাল ধমণী। ধমণীতে রক্ত চলাচলের জন্য নাড়ীর স্পন্দন সৃষ্টি হয়। যখনই হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত হয় তখনই রক্ত ধমণীতে প্রবেশ করে এবং স্পন্দন হয় আর হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হলে স্পন্দন থেমে যায়।

*** একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির প্রতি মিনিটে নাড়ীর ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কত বার ?**

প্রতি মিনিটে ৭২ থেকে ৮০ বার।

*** ঘুম পায় কেন ?**

আমরা যখন জেগে থাকি তখন স্নায়ু কেন্দ্রগুলি কর্মরত থাকে। বিশেষ করে ওরা রক্তকোষের সাহায্যে মস্তিষ্কে রক্ত পরিচালিত করে। কয়েক ঘণ্টা এইভাবে কাজ করলে ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে স্নায়ু কেন্দ্রগুলি। ফলে রক্ত চলাচলের বেগ অনেকখানি কমে আসে। এবং মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। উক্ত কারণে ঘুম পায় মানুষের। নিদ্রার পর স্নায়ু কেন্দ্রগুলি পুনরায় সতেজ হয়ে ওঠে এবং মস্তিষ্কও তখন কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। তাই নিদ্রার পরে অবসাদ দূর হয়।

* হাই ওঠে কেন ?

ঘুম পেলে অথবা ক্লান্তি বোধ করলে রক্তে অক্সিজেনের ঘাটতি ঘটে। ক্লান্ত শরীরে এবং ঘুমের প্রাক্কালে যে পরিমাণ অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে তা শরীরের প্রয়োজনের অপেক্ষা সাধারণত কমই হয়ে থাকে। তখনই অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে হাই ওঠে। কারণ, হাই উঠলে নাসিকা ছাড়াও মুখগহ্বর দিয়ে কিছু অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং এইভাবে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ করে নেয়।

* সাবান, সরষের তেল ইত্যাদি গায়ে লাগলে জ্বালা করে না কিন্তু চোখে লাগলে জ্বালা করে কেন ?

গায়ের চামড়া বা দেহত্বক দেহকে বাইরের যে কোন প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করার একটি আবরণ বিশেষ। সে তত বেশী স্পর্শকাতর নয়। কিন্তু চোখের অচ্ছোদপটল প্রভৃতি ভয়ানক স্পর্শকাতর। সামান্য উত্তেজকের স্পর্শও সহ্য করতে পারে না। ফলে জ্বালা করে!

* অন্ধকারে ভাল ঘুম হয় কেন ?

আলো একটি উত্তেজক। আলোর প্রভাবে আমাদের স্নায়ুসমূহ উত্তেজিত হয়। তখনই জড়তা দূর হয় আমাদের।

আমাদের মস্তিষ্ক, স্নায়ুসমূহ, মাংসপেশী ইত্যাদি দীর্ঘসময় কর্মক্ষম থাকলে এক সময় ওরা বিশ্রাম গ্রহণ করতে চায়। তখনই আসে ঘুম। যেহেতু আলো উত্তেজক। ওর প্রভাবে স্নায়ু, মাংসপেশী উত্তেজিত হয়। তাই আলোতে শরীর যত ক্লান্ত থাকুক না কেন ভাল ঘুম হতে পারে না। অপরপক্ষে অন্ধকারে কোন উত্তেজক না থাকায় ঘুম গাঢ় হয়।

* সকালে আমাদের ঘুম ভেঙে যায় কেন ?

সাধারণত প্রথম থেকে শেষ অবধি ঘুম একই ধরনের হয় না। প্রথমের দিকে ঘুম বেশ গভীর হয়। তখন কোন কিছুর শব্দ অথবা সামান্য কিছু উত্তেজক আমাদের ঘুম ভাঙাতে পারে না।

ঘুম ধীরে ধীরে পাতলা হতে আরম্ভ করে। অবশেষে সকালের দিকে একেবারে পাতলা হয়ে যায়। তখন সামান্য শব্দ, আলোক

ইত্যাদিতে আমাদের স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং ঘুমও ভেঙে যায়। তাছাড়া নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসও আমাদের সকালে ঘুম ভাঙাতে সাহায্য করে।

* এক জায়গায় অধিকক্ষণ পা গুটিয়ে বসলে পা ঝিনঝিন করে কেন?

পা গুটিয়ে বসলে পায়ের ওপর সমস্ত দেহটার চাপ পড়ে। ঐ চাপের প্রভাবে পায়ের স্নায়ুগুলির কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু স্নায়ুগুলো তাদের কাজ নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করে যেতে চায়। হঠাৎ তাদের সেই কাজে বাধা সৃষ্টি হলে তারা ছটফট করতে থাকে। তাদের ঐ ছটফটানিটাই প্রকাশ পায় পা ঝিনঝিনের ভেতর দিয়ে।

* হরমোন কি?

গ্রীক "হরমাও" শব্দটি থেকে ইংরাজী "হরমোন" কথাটি এসেছে। হরমাও শব্দের অর্থ "আমি উত্তেজনা সৃষ্টি করি।" তাই হরমোন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী পদার্থ।

প্রকৃতপক্ষে হরমোন দেহের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নির্গত এক রকমের উত্তেজক রস। এরা প্রোটিন জাতীয়। তাই হরমোন মাত্রই জটিল জৈব রাসায়নিক তরল।

হরমোন বা উত্তেজক রস এক বড় রকমের বিস্ময়। দেহে অনেক প্রকারের হরমোন ক্ষরিত হয়। এদেরই দ্বারা জীবের জন্ম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। শরীরের নানা জায়গায় ওরা গমনাগমন করতে পারে এবং দেহবৃদ্ধি, জনন ও নানা শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

* অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি কি?

আমাদের দেহের অগণিত কোষের কার্যাবলীর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের জন্য স্নায়ু যেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে তেমনই হরমোনও করে থাকে। এই হরমোন রাসায়নিক পদার্থ এবং ক্ষরিত হয় শরীরের অভ্যন্তরস্থ কয়েকটি গ্রন্থি থেকে। সেই গ্রন্থিগুলিকেই বলা হয় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। কারণ, ক্ষরিত হরমোন কোন নালীপথে প্রবাহিত হয় না। রক্তের দ্বারা বাহিত হয়ে দেহের

বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

* অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি কি কি এবং কোথায় কোথায় অবস্থিত ?

প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির মধ্যে (১) পশ্চাৎ মস্তিষ্কের তলদেশে স্ফিনয়েড অস্থিতে অবস্থিত সেলাটারসিকা নামক ছোট্ট একটি অস্থিপ্রকোষ্ঠে পিটুইটারী গ্রন্থি (২) শ্বাসনালীর দুপাশে দুটি খণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত থাইরয়েড গ্রন্থি (৩) থাইরয়েড গ্রন্থির পেছনে দুটি করে মোট চারটি ক্ষুদ্র গোলাকৃতি প্যারা থাইরয়েড গ্রন্থি (৪) দেহের উভয়-পার্শ্বে দুটি বৃক্কের ওপর অবস্থিত অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত প্রধান প্রধান গ্রন্থি ছাড়াও ল্যাংগার হ্যানসের দ্বীপপুঞ্জ, থাইমাস গ্রন্থি, পিনিয়াল গ্রন্থি প্রভৃতি আরও কতকগুলি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আছে।

* কোন্ কোন্ গ্রন্থি থেকে কি কি হরমোন ক্ষরিত হয় ?

পিটুইটারী গ্রন্থির সম্মুখভাগ থেকে মোট ৬টি হরমোন ক্ষরিত হয়। সেগুলির নাম বৃদ্ধিপোষক হরমোন, থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন, অ্যাডরেনাকর্টিকোট্রোফিক হরমোন, ডিম্বথলী উদ্দীপক হরমোন, লিউটিলাইজিং হরমোন ও লিউটিওট্রফিক হরমোন। আর পিটুইটারী গ্রন্থির পশ্চাংভাগ থেকে ক্ষরিত হয় অ্যান্টিডাইয়ুরেটিক এবং অক্সিটোসিন নামক মাত্র দুটি হরমোন।

অন্যান্য গ্রন্থি থেকে এত অধিক সংখ্যক হরমোন ক্ষরিত হয় না। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন ও ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন নামক মাত্র দুটি হরমোন ক্ষরিত হয়। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয় একটি হরমোন প্যারাথরমোন। অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে দুটি হরমোন অ্যাড্রেনালিন ও নর অ্যাড্রেনালিন। ল্যাংগার হ্যানসের দ্বীপপুঞ্জ থেকে ক্ষরিত হয় জিঙ্ক ঘটিত প্রোটিন হরমোন ইনসুলিন।

* মাষ্টার অফ গ্ল্যাণ্ড কাকে বলে ?

পিটুইটারী গ্রন্থিকে।

* ছুটাছুটি করলে হৃৎপিণ্ড দ্রুতহারে স্পন্দিত হয় কেন ?

ছুটাছুটি করলে দেহে অক্সিজেনের চাহিদা বাড়ে। অপরদিকে

রক্তে তখন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণও বেড়ে যায়। দূষিত রক্তকে শুদ্ধ করতে এবং অক্সিজেনকে বহন করতে হয় বলে দেহে সেই অবস্থায় রক্ত চলাচলও বাড়ে। যেহেতু হৃৎপিণ্ডই উক্ত কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। তাই ছুটাছুটি করলে তার কাজ বেড়ে যায়। ফলে দ্রুত রক্ত চলাচল হয় এবং স্পন্দিত হয় দ্রুতহারে।

*** কোন কোন মানুষ অত্যন্ত বেঁটে বা "বামন" হয় কেন?**

মস্তিষ্কের নিচে যে পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি আছে তা থেকে নির্গত বৃদ্ধিপোষক হরমোন শরীরের হাড়গুলিকে পুষ্ট করে। এবং পেশীকলারও বৃদ্ধিসাধন করে। যদি পিটুইটারী গ্রন্থি দুর্বল হয় তাহলে বৃদ্ধিপোষক হরমোন কম ক্ষরিত হয়। ফলে এই ক্ষেত্রে মানুষ হয় বেঁটে।

উল্টোটাও হয়ে থাকে। যদি পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে বৃদ্ধিপোষক হরমোনের ক্ষরণ অধিক হয় তাহলে মানুষ দৈত্যের মত চেহারা লাভ করে।

*** মেদবৃদ্ধি হয় কেন এবং মেদবৃদ্ধির ফল কি?**

আমাদের দেহের গ্রন্থিগুলি থেকে হরমোন ছাড়াও অন্যান্য জিনিস ক্ষরিত হয়। বিশেষ করে থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণ যদি কোনপ্রকারে হ্রাস পায় তাহলে শরীরে অহরহ যে দহন ক্রিয়া চলছে তাও হ্রাস পাবে। তখন দহনের অভাবে দেহে সঞ্চয়ের পরিমাণ ধীরে ধীরে বেড়ে উঠবে এবং শরীরকে মেদবহুল করবে। অতিরিক্ত খাদ্যগ্রহণ, শ্রম না করা, অলস হয়ে বসে থাকা ইত্যাদির ফলেই শারীরিক গ্রন্থি-সমূহের ক্ষরণ হ্রাস পায় এবং শরীরে মেদ জমে।

শরীরে মেদ জমলে শরীর ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজ করার স্পৃহা থাকে না। অল্প পরিশ্রম করলে প্রচুর ঘাম বেরিয়ে শরীরকে আরও অবসন্ন করে ফেলে। অবশেষে নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয় শরীর।

তবে মেদের যে আদৌ প্রয়োজন নেই এমন নয়। দেহের ক্লান্তি বৃদ্ধি করে মেদ। কোন সময় উপবাসী থাকলে ঐ মেদই শরীরকে প্রয়োজনীয় শক্তি দান করে। অত্যধিক মেদবৃদ্ধিই অশুভের

লক্ষণ। এই অবস্থায় মেদকে কমাতে হলে ঘি, মাখন, মিষ্টি, শর্করা-জাতীয় খাদ্য, এমনকি দুধকেও বর্জন করা উচিত। গ্রহণ করতে হয় টাটকা ফল, মাছ, মাংস, সব্জি, মাঠাতোলা দুধ ইত্যাদি।

* ফুসফুস কি এবং তার কাজই বা কি?

ফুসফুস আসলে লক্ষ লক্ষ হাওয়া ভর্তি থলের সমন্বয়। আমাদের হৃৎপিণ্ডের দুদিকে দুটি ফুসফুস অবস্থান করছে। ওর প্রতিটি থলের সঙ্গে আছে এক একটি কৈশিক ঝিল্লী। আমাদের প্রতিটি দেহ-কোষের কাজকর্ম চালাবার জন্য দরকার হয় অক্সিজেনের। নাক নিয়ে যে প্রশ্বাস আমরা গ্রহণ করে থাকি সেটি নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করার পর প্রথমে গলবিল পরে স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালী হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে। আর ফুসফুস থেকে রক্ত কণিকারা অক্সিজেনকে গ্রহণ করছে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে ত্যাগ করছে। ফুসফুসে যে সব কৈশিক ঝিল্লী আছে তার দ্বারই অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড যাতায়াত করে।

* প্রতি মিনিটে আমরা কতবার শ্বাসগ্রহণ করে থাকি?

১৮ থেকে ২০ বার।

* বৃক্ক বা কিড্‌নী কেমন জিনিস? এবং কোথায় থাকে?

আমাদের দেহের অনেকটা পেছনের দিকে পেটের দুপাশে তথা মেরুদণ্ডের উভয়দিকে অনেকটা সিমের বীচির মত দুটি জিনিস থাকে। তন্তুময় কলার দ্বারা গঠিত এবং একটা আবরণের দ্বারা আবৃত। উক্ত জিনিস দুটিকে বলা হয় বৃক্ক বা কিড্‌নী। ওকে মূত্রগন্থিও বলা হয়।

* কিড্‌নীর কাজ কি?

কিড্‌নী মানবদেহের প্রধান অঙ্গগুলির মধ্যে একটি। সারাদিনে সে প্রায় ২০০ লিটার রক্তকে শোধন করে এবং বর্জ্য পদার্থের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগকে নিষ্কাশন করে। আশ্চর্য এই যন্ত্রটি দেহের কোন প্রয়োজনীয় জিনিসকে বার হতে দেয় না এবং দেহে কোন্ কোন্ জিনিসের প্রয়োজন, সেদিকেও লক্ষ্য রাখে।

কিড্নীর প্রধান প্রধান কাজগুলির মধ্যে দেহের বিপাকীয় কার্যকলাপের ফলে খাদ্যবস্তুর অসার অংশ তথা নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থকে মূত্রের আকারে শরীর থেকে বার করে দেওয়া অম্ল ও ক্ষারের মধ্যে সমতা রক্ষা করা, রক্ত চাপ ঠিক রাখা ইত্যাদি। কিড্নী অকেজো হয়ে গেলে রক্তে বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। পরিণামে নানা রোগ আক্রমণ করে থাকে।

* কিড্নী কি খারাপ হয় এবং এই অবস্থায় প্রতিকার কি ?

কিড্নী অবশ্যই খারাপ হয়। অনেকের আবার জন্ম থেকে মাত্র একটি কিড্নী কাজ করে থাকে। কখনও কখনও একটি কিড্নী অকেজো হয়ে যায় এবং অন্যটি ভাল থাকে।

দেখা গেছে, একটি কিড্নী ভাল থাকলেই শরীরের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু দু-দুটি কিড্নী যদি অকেজো হয়ে যায় তাহলে বিপদ। এই অবস্থায় কোন সুস্থ ব্যক্তি তাঁর একটি কিড্নীকে দান করতে পারেন। তবে একমাত্র যমজ ছাড়া অন্যের কিড্নী অনেক ক্ষেত্রে বিপত্তি ঘটায়। অন্যের কিড্নী দেহে প্রোটিনের মধ্যে "অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি" নামক ক্রিয়া শুরু করে। ফলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্তও হতে পারে। তাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কৃত্রিম কিড্নী যন্ত্র যোগ করে রক্ত পরিশোধন বা ডায়ালিসিসের ব্যবস্থা করা হয়।

* শরীরে বর্জ্য পদার্থ কিভাবে উৎপন্ন হয় ?

রক্ত খাদ্যের সার অংশগুলি এবং অক্সিজেন বহন করে কোষে কোষে পৌঁছে দেয়। কোষ সেগুলিকে কাজে লাগায়, অক্সিজেনকে গ্রহণ করে এবং পরিত্যাগ করে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে। তাছাড়া ঐ কোষের মধ্যে নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়াও ঘটে। উক্ত প্রক্রিয়ার ফলেই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর কতকগুলি দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয়। ঐ দূষিত পদার্থগুলিই বর্জ্য পদার্থ। এগুলি সাধারণত ঘাম, মূত্র ইত্যাদির মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

* মূত্র কি ? একজন মানুষের দেহ থেকে সারাদিনে কত মূত্র নির্গত হয় ?

মূত্র এক রকমের বর্জ্য পদার্থ। পরিষ্কার, হালকা হলুদ বর্ণের, অম্লধর্মী ও বিশেষ গন্ধযুক্ত তরল। বৃক্ক তথা কিড্‌নি থেকেই, নির্গত হয়।

একজন মানুষ সারাদিনে প্রায় দেড় লিটার মূত্র ত্যাগ করে।

* একজন মানুষ মূত্রের মাধ্যমে সারাদিনে কোন্ কোন্ বর্জ্য পদার্থকে পরিত্যাগ করে এবং তাদের পরিমাণ কত?

মূত্রের মাধ্যমে মানুষ জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার উপাদানকে পরিত্যাগ করে। উপাদানগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিত্যাগ করে নাইট্রোজেন ও ইউরিয়াকে। উভয়ের পরিমাণ ২৫ থেকে ৩০ গ্রামের মত। অন্যান্য জৈব পদার্থের মধ্যে থাকে ১·৪ গ্রাম ক্রিয়াটিনিন, ০·৭ গ্রাম অ্যামোনিয়া, ০·৭ গ্রাম ইউরিক অ্যাসিড, ০·২ গ্রাম প্রোটিন এবং স্বল্প পরিমাণ গ্লুকোজ, অক্সালিক অ্যাসিড, কিটোন বস্তু ও অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড বিদ্যমান।

অজৈব বস্তুগুলির মধ্যে থাকে প্রায় ১০ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড, ২ গ্রাম পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ২·২ গ্রাম ফসফরাস, ২ গ্রাম সালফার, ০·২ গ্রাম ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম এবং অল্প আয়োডিন।

মূত্রে প্রোটিন, গ্লুকোজ, কিটোন বস্তুর পরিমাণ যদি বাড়ে এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ ও রক্ত যদি নিঃসৃত হয় তাহলে রোগের প্রভাবেই হয়ে থাকে।

* পৌষ্টিক তন্ত্র কাকে বলে?

পৌষ্টিক নালী তৎসহ উক্ত নালী থেকে দূরে অবস্থিত নানারকম পাচকরস ক্ষরণকারী গ্রন্থিসমূহ পৌষ্টিক তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। অপর দিকে আমাদের পৌষ্টিক নালীটা মুখগহ্বর থেকে মলাশয় পর্যন্ত বিস্তৃত। এর কয়েকটি বিভাগ আছে। বিভাগগুলি যথাক্রমে মুখ-গহ্বর, জিহ্বা, গলবিল, গ্রাসনালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র।

* পৌষ্টিক নালীর কাজ কি?

পৌষ্টিক নালীটি শরীরের বৃহত্তম অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে নানারকম জারক রস ও হরমোন নির্গত হয়ে খাদ্যকে হজম

করতে সাহায্য করে।

পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশ থেকে নির্গত হরমোন বিবিধ কর্ম সম্পাদন করে থাকে। তন্মধ্যে পাকস্থলী থেকে ক্ষরিত গ্যাসট্রিন হরমোন পাকস্থলীর রস ক্ষরণে সাহায্য করে, ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে সিক্রিটিন এবং কোলেসিসটোকাইনিন নামক দুটি হরমোন যথাক্রমে অগ্ন্যাশয় রসের ক্ষরণে এবং পিত্তাশয়ের সঙ্কোচন ও অগ্ন্যাশয় রসের বিভিন্ন উৎসেচক ক্ষরণে সাহায্য করে।

* খাদ্য কিভাবে পরিপাক হয়?

খাদ্য পরিপাকের ব্যাপারটা একেবারে রাসায়নিক প্রক্রিয়া। বেশ জটিলও বটে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, খাদ্যবস্তু মুখে পুরলে কতকটা যেন নিজে থেকে চোয়ালগুলি এবং জিভ ওঠানামা করতে থাকে। তারপর খাদ্যের বড় বড় টুকরোগুলো দাঁতের দ্বারা ছেদন ও পেষণে ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় মুখগহ্বর থেকে লালারসের ক্ষরণ ঘটে এবং খাদ্যের টুকরোগুলি ঐ লালারসের সংস্পর্শে আসে। তখনই এক মণ্ডের আকার প্রাপ্ত হয় ও আমাদের গলাধঃকরণে সুবিধা হয়।

অতঃপর গ্রাসনালী দিয়ে সেই মণ্ড নেমে যায় পাকস্থলীতে। পৌষ্টিক নালীস্থিত গলবিল ও গ্রাসনালী অবশ্য খাদ্য পরিপাকে বিশেষ সাহায্য করে না। পাকস্থলীতে খাদ্য প্রবেশ করলেই তিন পর্যায়ে জারক রসের ক্ষরণ ঘটে। প্রথম স্নায়ুজ পর্যায়ে ক্ষরণ ঘটে পেপসিনোজেন ও হাইড্রোক্লোরিক অম্ল, দ্বিতীয় পাকস্থলী পর্যায়ে গ্যাসট্রিন নামক হরমোন ও হাইড্রোক্লোরিক অম্ল, তৃতীয় আন্ত্রিক পর্যায়ে নিঃসৃত হয় কয়েকটি হরমোন।

উক্ত তিন পর্যায়ে পাচকরস, হরমোন, কয়েকটি উৎসেচক বা এনজাইম প্রভৃতির দ্বারা পরিপাক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

* খাদ্যের সারবস্তু কিভাবে কোষসমূহে বাহিত হয়?

খাদ্যবস্তু পৌষ্টিক তন্ত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশের জারক রসের সংস্পর্শে কয়েকটি সরল অণুতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে তখনই সম্পন্ন

হয় পরিপাক ক্রিয়া। অতঃপর খাদ্যের সেই সকল অণুগুলি পৌষ্টিক নালীর অপর এক অংশ ৬ থেকে ৭ মিটার দীর্ঘ এক নালী তথা ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। ক্ষুদ্রান্ত্রটা দু-স্তবক পেশীস্তর দিয়ে গঠিত। এর গায়ে ছোট ছোট গর্ত এবং গর্ত সন্নিহিত অঞ্চলে থাকে ছোট ছোট আঙুলের মত জিনিস। এগুলিকে ইংরাজীতে বলা হয় ভিলাই। খাদ্যবস্তুর ক্ষুদ্র অণুগুলি ঐ ভিলাইসমূহে অবস্থিত শিরায় প্রবেশ করে। তারপর পোর্টাল শিরা নামক এক ধরনের শিরার দ্বারা বাহিত হয়ে যকৃতে যায়। যকৃত থেকে যায় ফুসফুসে। সর্বশেষে ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে প্রবেশ করে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে। হৃৎপিণ্ডের ক্রমাগত সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্যের সারবস্তু তথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু মহাধমনীতে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে এবং রক্তের দ্বারা বাহিত হয়ে দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে।

* দেহের পুষ্টিসাধন কি?

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যগ্রহণ, খাদ্যের পরিপাক, খাদ্যের সারাংশের শোষণ, আত্তীকরণ ও অপাচ্য অংশ বহিষ্করণ সম্পন্ন হয় এবং শোষিত পদার্থের শক্তির দ্বারা জীবনের মৌলিক ধর্মগুলি পালিত হয় তাকেই পুষ্টিসাধন বলে।

* সুষম খাদ্য কাকে বলে?

যে খাদ্য দেহের বৃদ্ধিসাধনে সহায়তা করে, নানা শরীরবৃত্তীয় কাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে, প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয় তাকেই বলা হয় সুষম খাদ্য। সুষম খাদ্যে শর্করা, স্নেহপদার্থ, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও জল প্রভৃতি দেহগঠনের যাবতীয় উপাদান সঠিক পরিমাণে থাকে।

* প্রোটিন কি?

দেহগঠনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রোটিনের অণু অতিকায় ও জটিল। এর মধ্যে প্রায় ২০ রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। ঐ ২০টির মধ্যে মিথিওনিন, ট্রিপটোফ্যান, থ্রিওনিন, ভ্যালিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, লাইসিন, ফিনাইল অ্যালানিন নামক ৮টি

অ্যামিনো অ্যাসিড আবার অপরিহার্য উপাদান। যে প্রোটিনে ঐ ৮টি উপাদান বর্তমান থাকে তাকে বলা হয় প্রথম শ্রেণীর বা সম্পূর্ণ প্রোটিন। কিন্তু ৮টির একটিও যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে তাকে বলা হয় অসম্পূর্ণ বা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন। সাধারণত মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি প্রাণীজ প্রোটিন সম্পূর্ণ প্রোটিন এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটিন অসম্পূর্ণ প্রোটিন।

* প্রোটিনের কাজ কি এবং অতিরিক্ত প্রোটিন শরীরের পক্ষে কি ক্ষতিকর?

প্রোটিনের প্রধান কাজ শরীরে নতুন নতুন কোষ সৃষ্টির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহ করা। সাধারণত ছোটদের ক্ষেত্রে কোষবৃদ্ধির পরিমাণ বড়দের তুলনায় অনেক বেশী। তাছাড়া কোষের ক্ষয়পূরণও করতে হয়। অপরদিকে বয়স্কদের ক্ষেত্রে কেবল মাত্র কোষের ক্ষয়পূরণের জন্যই নতুন কোষসৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে থাকে। সেই কারণে ছোটদের ক্ষেত্রে অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহের জন্য যে পরিমাণ প্রোটিনের আবশ্যক সে পরিমাণ বয়স্কদের ক্ষেত্রে হয় না। তাছাড়া আমরা প্রোটিনের মাধ্যমে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন গ্রহণ করি তার প্রায় সবই রেচিত হয়ে বেরিয়ে যায়। অতএব উপযুক্ত নাইট্রোজেন সরবরাহও প্রোটিনের কাজ।

অত্যধিক প্রোটিন গ্রহণ করলে অত্যধিক অ্যামিনো অ্যাসিডকে হজম করতে হয়। ফলে শক্তির সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু দেহে চর্বিরও সৃষ্টি হয়। তাই অতিরিক্ত প্রোটিন বর্জন করাই বিধেয়। তবে অনেক সময় অতিরিক্ত প্রোটিন শরীরের অন্যান্য বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

* মানবদেহে প্রোটিনের পরিমাণ কত?

শতকরা প্রায় ১৫ ভাগের মত।

* দেহে শর্করা ও স্নেহজাতীয় পদার্থের ভূমিকা কি?

দেহে শক্তির চাহিদা পূরণ করে শর্করা এবং শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পাদন করে স্নেহজাতীয় পদার্থ। তবে স্নেহজাতীয় পদার্থ প্রোটিন কিংবা শর্করার মত সম্পূর্ণরূপে অপরিহার্য বলা যায় না।

* ভিটামিন কি ?

প্রোটিন, শর্করা, স্নেহজাতীয় উপাদান ছাড়াও আমাদের খাদ্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। এটির কোন খাদ্য মূল্য নেই। শরীরের পুষ্টিসাধনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে না। তথাপি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, এর অভাব ঘটলে শরীর ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। অপরদিকে নানা প্রকার রোগের আক্রমণ থেকেও ভিটামিন দেহকে রক্ষা করে থাকে।

* ভিটামিন কত প্রকারের ও কি কি ?

ভিটামিন সাধারণত সাত প্রকারের। এ, বি, সি, ডি, ই, জি ও কে।

* কোন্ কোন্ খাদ্যে কোন্ কোন্ ভিটামিন থাকে ?

ডিমের কুসুম, কড্ মাছের তেল দুধ ইত্যাদিতে থাকে ভিটামিন এ। ঢেঁকিছাটা চাল, অঙ্কুরিত ছোলা ও গম, মাছ, ডাল ও শাকসব্জিতে থাকে ভিটামিন বি। ভিটামিন সি পাওয়া যায় লেবুতে, অঙ্কুরিত ছোলা ও মুগে, টমেটোতে, আমলকী, আনারস, পেঁপে, আপেল, পাকা কলা ইত্যাদিতে। সূর্যপক্ক জিনিস যথা বড়ি, নানাবিধ আচার প্রভৃতিতে। তাছাড়া সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি চামড়ায় পড়লেও আপনা হতেই তৈরি হয়। দুধ, মাছ, মাংস ও শাকসব্জীতে ভিটামিন ই, ডিম, দুধ ও টাটকা শাকসব্জীতে ভিটামিন জি এবং একমাত্র শাকসব্জীতে পাওয়া যায় ভিটামিন কে।

* কোন কোন ভিটামিনের অভাবে কি কি রোগ হয় ?

(১) ভিটামিন এ-র অভাবে মানুষ রাতকানা হয়। তাছাড়া চোখের নানা রকম রোগ, দাঁতের পাইওরিয়া রোগ, নানা প্রকার চর্মরোগ এমনকি যক্ষ্মাও হতে পারে।

(২) ভিটামিন বি-র অভাবে বেরিবেরি নামক রোগটি হয়ে থাকে।

(৩) দেহে ভিটামিন সি-র গুরুত্ব অনেকখানি। দেহের অস্থি, দাঁত, ত্বক ইত্যাদিকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে উক্ত ভিটামিনটি। তাছাড়া রক্তের লোহিত কণিকা উৎপাদনে এবং শারীরবৃত্তীয় কাজেও এর প্রয়োজন হয়ে থাকে।

ভিটামিন সি-র অভাবে স্কার্ভি নামক এক ধরনের রোগ হয়ে থাকে। তাছাড়া সর্দিকাশি, নানাবিধ চর্মরোগ, এমনকি হৃদরোগ পর্যন্তও এর অভাবে হতে পারে। দেহে ভিটামিন সি-র অভাব হতে থাকলে শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়, রক্তে লোহিত কণিকা ও শ্বেতকণিকার হ্রাস পায়, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে ইত্যাদি। দেখা গেছে এই ভিটামিনটির অভাবে হাড়ও সুগঠিত হয় না।

(৪) ভিটামিন ডি-র অভাবে রিকেট রোগ হয় এবং অস্থি ভালভাবে গঠিত হতে পারে না।

(৫) ভিটামিন ই-র অভাবে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

(৬) ভিটামিন জি ও ভিটামিন কে রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এবং রক্তপাত বন্ধ করতে পারে।

* **সম্পূর্ণ খাদ্য কাকে বলে?**

দুধকে। কারণ দেহগঠনের যাবতীয় উপাদান ঐ খাদ্যটির মধ্যে আছে। তাছাড়া দুধ সহজ পাচ্যও।

* **ক্যালোরি কি?**

শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তারই একককে বলে ক্যালোরি। ঐ শক্তি মানুষ খাদ্য থেকেই গ্রহণ করে থাকে।

* **একজন মানুষকে কর্মক্ষম রাখতে দৈনিক কত ক্যালোরি শক্তির প্রয়োজন?**

পুরুষদের ক্ষেত্রে ২২০০ ক্যালোরি এবং স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে ১৮০০ ক্যালোরি।

* **নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ না করলে কি হয়?**

খাদ্য নিয়মিতভাবে গ্রহণ না করলে অপুষ্টি আসে। এই অপুষ্টি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে অজীর্ণের মাধ্যমে। তারপর আমাশয় জাতীয় রোগের জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। কখনও কখনও কেঁচো জাতীয় পরজীবীরা অন্ত্রে বাসা বাঁধে। তখন ব্যাধির মন্দির হয়ে ওঠে শরীরটা। সর্দি, কাশি এমনকি যক্ষ্মার দ্বারাও আক্রান্ত হয় শরীর।

* ঢেঁকুর ওঠে কেন ?

ফুসফুস থেকে হঠাৎ অত্যধিক বায়ু বেরিয়ে আসার ফলে আমাদের কণ্ঠনালীতে এক ধরনের শব্দ হয়, ওকেই ঢেঁকুর বলে ঢেঁকুর ভাল নয়। ঢেঁকুর উঠলে জলপান করে ঢেঁকুর বন্ধ করা উচিত।

* ভিটামিন নামটি কার দেওয়া ?

রসায়নবিদ ক্যাসিমিফ্রাঙ্ক প্রথম 'ভিটামিন'—এই নামকরণটি করেছিলেন।

* জল কি খাদ্য ?

জীবনধারণের জন্য যদিও উপযুক্ত পরিমাণে জলপানের প্রয়োজনীয়তা আছে তবুও জল খাদ্য নয়। প্রকৃত খাদ্য বলা হয় প্রোটিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ, কারবোহাইড্রেট প্রভৃতিকে। কারণ, এরা আমাদের দেহের অভ্যন্তরে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় এবং তাপ উৎপাদন করে। ওদের আছে যথেষ্ট ক্যালোরি মূল্য। কিন্তু জল রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায় না এবং ওর ক্যালোরি মূল্যও নেই।

* নাক ডাকার কারণ কি ?

ফুসফুসে যাওয়ার পথে প্রশ্বাস যদি গলার মধ্যে স্বরযন্ত্রের কোষে বাধা পায় তাহলে একরকম শব্দ হয়। শোওয়ার দোষে এবং ঘুমের সময়ই এরকমটি হয়ে থাকে। অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টির ফলেই নাক দিয়ে এক ধরনের অস্বাভাবিক শব্দ বহির্গত হয়। ওকেই আমরা নাক ডাকা বলি।

* বিষম খাওয়ার কারণ কি ?

আমাদের শ্বাসনালীর সঙ্গে খাদ্যনালীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। অন্যমনস্ক অবস্থায় খাদ্য খেতে থাকলে অনেক সময় পেশী সংকোচনের ফলে শ্বাসনালীর মুখে খাদ্যকণা ঢুকে পড়ে। তখনই ফুসফুসের প্রতিক্রিয়ায় খাদ্যকণাকে শ্বাসনালী থেকে বার করে নেওয়ার জন্য আমরা বিষম খাই।

* চুল পাকে কেন ?

চুলের গোড়ায় এক রকম রঞ্জক পদার্থ থাকে। ঐ কারণে চুলকে

কালো দেখায়। বয়স বাড়লে ঐ রঞ্জক পদার্থের ঘাটতি ঘটে। তখনই চুল পাকতে আরম্ভ করে। তবে কম বয়সেও ঘাটতি ঘটে থাকে। তখনই কম বয়সের ছেলে-মেয়েদেরও চুল পাকতে আরম্ভ করে।

* ট্রেস এলিমেণ্ট কাদের বলা হয়? শরীরে ওদের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

আমাদের দেহের নানা উপাদানের সঙ্গে অতি অল্প পরিমাণ মৌলিক পদার্থ মিশে আছে। মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে ধাতুর সংখ্যাই অধিক। আমরা জানি লোহা রক্তের একটি অপরিহার্য উপাদান। রক্তে তামা প্রভৃতি অন্যান্য ধাতব উপাদানও থাকে। এ-ছাড়া অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে থাকে দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট প্রভৃতি। রক্তে লোহিত কণিকা তৈরির কাজে কোবাল্টের ভূমিকা আছে। হাড়ে থাকে দস্তা ও ফসফরাস। ফসফেটেজ নামে একপ্রকার এনজাইম হাড়কে ফসফরাস সরবরাহ করে। কিন্তু দেহে যদি ম্যাঙ্গানিজের ঘাটতি ঘটে—তাহলে ফসফরাস সরবরাহ ব্যাহত হয় এবং ঠিকমত অস্থি সুগঠিত হয় না। দেখা গেছে ভিটামিনের মত এগুলিও আমাদের জীবনধারণ ও পুষ্টিলাভের পক্ষে একান্ত সহায়ক। দেহে অতি অল্প-মাত্রায় এরা অবস্থান করছে বলে এদের বলা হয় ট্রেস এলিমেণ্ট।

পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, প্রায় চল্লিশটির মত ট্রেস এলিমেণ্ট আমাদের দেহে বিদ্যমান। আমাদের দেহে অহরহ যে রাসায়নিক ক্রিয়া চলছে তাতে এরা অনেক ক্ষেত্রে অনুঘটকের মত কাজ করে থাকে। এদের অভাব ঘটলে, নানা অপুষ্টিজনিত রোগ হয়ে থাকে। এরা সাধারণত রক্ত, দেহতন্তু, দেহরস ইত্যাদিতে বিদ্যমান।

* শরীরে ট্রেস এলিমেণ্টের পরিমাণ বাড়লে কি হয়?

সাধারণত একজন সুস্থ ও সবল মানুষের দেহে ১০৫০ গ্রাম ক্যালসিয়াম, ২৪৫ গ্রাম পটাসিয়াম, ১০৫ গ্রাম সোডিয়াম, ৩৫ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ৭২৫ মিলিগ্রাম লোহা, ১৫০ মিলিগ্রাম তামা, ২০ মিলিগ্রাম ম্যাঙ্গানিজ, ১৫ মিলিগ্রাম মলিবডিনাম, ৩ মিলিগ্রাম কোবাল্ট এবং ১.৫ মিলিগ্রাম ক্রোমিয়াম থাকার প্রয়োজন আছে। উক্ত

পরিমাণের অধিক হলে বা কমলে শরীরের পক্ষে ক্ষতি হয়।

প্রথমে লোহার কথা ধরা যেতে পারে। এই ধাতুটি রক্তের হিমোগ্লোবিনে থাকে। সামান্য পরিমাণে অভাব ঘটলেই শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটবে এবং রক্তাল্পতা দেখা দেবে। কিন্তু পরিমাণটা বেশী হলেই "লিভার সিরোসিস" রোগে আক্রান্ত হয় মানুষ।

রক্তকণিকায় তামাও থাকে। আমাদের চুলের উপাদানগুলির মধ্যে একটি তামা। কিন্তু ওপরে যে পরিমাণটার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই পরিমাণ অতিক্রান্ত হলেই তামা দেহে বিষক্রিয়া করে। উক্ত বিষক্রিয়ার ফলে উইলসন্‌স রোগ হয়। তাছাড়া অতিরিক্ত তামা যকৃতেরও ক্ষতিসাধন করে।

আমাদের দেহে ক্রোমিয়ামের পরিমাণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে। ক্রোমিয়াম কমলে বহুমূত্র রোগ হয়ে থাকে।

*** শরীরের পক্ষে অবাঞ্ছিত ধাতু কোনগুলি? এগুলি কিভাবে দেহে সঞ্চিত হয়?**

শরীরের অবাঞ্ছিত ধাতু বলতে আমরা ক্যাডমিয়াম, সীসা ও নানা তেজষ্ক্রিয় ধাতুকে মনে করতে পারি।

অবাঞ্ছিত ধাতু পরিবেশ দূষণের ফলেই আমাদের দেহে সঞ্চিত হয়। যেমন সীসার পাইপের জল খেলে সীসা ও ক্যাডসিয়ামের আধিক্য ঘটে। অতিরিক্ত পরিমাণ ফসফেট জাতীয় সার প্রয়োগের ফলে উদ্ভিদদেহে ক্যাডসিয়াম সঞ্চিত হয় এবং শাকসব্জির মাধ্যমে সেই ক্যাডসিয়ামকে আমরা গ্রহণ করছি। রং, সলডার, পেট্রোলের ধোঁয়ার মাধ্যমে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছে সীসা এবং শিল্পাঞ্চলের বস্তি এলাকায় পুরাতন রঙচটা বাড়ির দেওয়ালে জমে সেই সীসা। আপন অজান্তে সেগুলি আমরা গ্রহণ করে চলেছি। তাছাড়া অহরহ পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয়ছাই মিশছে জলে, মাটিতে। সঞ্চিত হচ্ছে উদ্ভিদদেহেও।

দেখা গেছে "আর্টারি হার্ডেনিং" ও হার্ট-রেকেজের মূল কারণ ক্যাডসিয়াম। সিসার হয় মৃদু বিষক্রিয়া। এই বিষক্রিয়ায় শিশুরাই

বেশী পরিমাণে শিকার হয়ে থাকে। বয়স্করাও নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। অপরপক্ষে তেজস্ক্রিয় ধাতুর বিষক্রিয়া সবচেয়ে মারাত্মক। এর দ্বারা আক্রান্ত হলে অনেক ক্ষেত্রে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব হয়। তার ওপর ক্যানসার নামক দুরারোগ্য ব্যাধিরও কবলে পড়ে মানুষ।

*** অবাঞ্ছিত ধাতু অথবা কোন ধাতুর পরিমাণ দেহে বাড়লে তার থেকে নিষ্কৃতি-লাভের উপায় কি?**

বর্তমানের উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞান যন্ত্রের সাহায্যে দেহে কোন ধাতুর পরিমাণ কতখানি বেড়েছে তা সহজে নির্ণয় করতে পারে। তখন ওষুধ হিসাবে এমন এক সহগকে প্রয়োগ করা হয়, যা শরীরে অবাঞ্ছিত ধাতুটির সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে যৌগিক গঠন করে। তারপর সেই যৌগিকটি মলমূত্রের সঙ্গে দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়।

*** মানুষের ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয় কেন?**

ক্রুদ্ধ হওয়াটা কেবলমাত্র সামাজিক অপরাধ নয়, আমাদের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে হাত পায়ের মাংসপেশী স্ফীত হয়ে ওঠে, চোখ কান লাল হয়ে ওঠে, ঘাম ঝরে, এমনকি আমাদের ফুসফুসের আয়তনও বৃদ্ধি পায়। ফুসফুসের আয়তন বৃদ্ধি খুবই মারাত্মক। এরই ফলে ফুসফুস হয়ে ওঠে ভয়ানক সক্রিয়। তার প্রমাণ, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে নিঃশ্বাস বেশ ঘন ঘন বেরিয়ে আসতে থাকে। প্রচণ্ড পরিশ্রমের পরও এতখানি হয় না। ফলে এমন দহনক্রিয়া চলতে থাকে যে, তার ক্ষয়পূরণের জন্য প্রচুর শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজন। যেহেতু আমরা খাদ্য থেকেই শক্তি গ্রহণ করি। এই অবস্থায় যে শক্তি উৎপাদনের দরকার পড়ে তা সাধারণ খাদ্যের দ্বারা সম্ভব হয় না।

মানুষ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে তার হৃৎপিণ্ডের কাজও বেড়ে যায়। তখন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অনেক দ্রুত হয়। প্লীহা থেকে রক্তকোষ নির্গত হয়, রক্তে অক্সিজেন পরিবহণ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় দেহে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা সরবরাহ করে যকৃত থেকে গ্লাইকোজেন নিঃসৃত হয়ে। এটিও

শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর এবং অতিরিক্ত গ্লাইকোজেন নিঃসৃত হলে হজমের গোলমাল হয়।

ক্রোধের সময় শরীরের আরও অনেক উৎসর্গ দেখা যায়। এই সময় কতকগুলি গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি সক্রিয় হয়ে উঠে। যার ফল দেহের নার্ভাস সিস্টেমের উপর প্রচণ্ড-চাপ। মস্তিষ্কে তখন রক্ত চলাচলের মাত্রাও ভয়ানকভাবে বেড়ে যায়। তাই চোখ ও কান লাল হয়ে উঠে। ক্রোধের সময় নানারকম দুর্ঘটনা ঘটাও অসম্ভব নয়।

* মনের অসুখ হয় কেন ?

মনের অসুখ সাধারণত মানসিক অশান্তির ফল। পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পারলে এবং মনের মধ্যে অভাব বোধ থাকলে দেহে নানারকম উপসর্গ দেখা যায়। যেমন, অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হওয়া, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি। অথচ চিকিৎসকরা বারবার পরীক্ষা করেও দেহের কোন রোগকে ধরতে পারেন না! এক্ষেত্রে তারা রোগীর মানসিক অসুখ বলে ঘোষণা করেন।

ডাক্তাররা মনে করেন, রক্তে যদি ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহলে মানসিক রোগ হয়ে থাকে। এমনিতে শারীরিক শ্রমের সময় আমাদের দেহে গ্লুকোজের পরিবর্তন হয়। গ্লুকোজ থেকেই ল্যাকটিক অ্যাসিডের উৎপত্তি হয়। ঐ অ্যাসিড আবার সবটা অবিকৃত থাকে না। অধিকাংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইডও জলে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু কিছু কিছু থেকে যায় এবং রক্তে মিশে যায়। মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য থাকলে, ঠিকমত পরিশ্রম থেকে বিরত থাকলে রক্তে ওর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এটি অনেক সময় বংশগত হয়েও দাঁড়ায়। তাই মহাজনদের উপদেশ মানতে হয়। পৌরুষ অবলম্বন করা, সৎ চিন্তা, সৎ গ্রন্থপাঠ ইত্যাদি মনকে সুস্থ রাখতে সমর্থ।

* অসুখ করলে আমাদের দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় কেন ?

আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করে থাকি, সেগুলি জারণের ফলে, আমাদের শরীরকে কর্মক্ষম রাখে। ফলে শরীরে তাপের সৃষ্টি হয়। এই তাপ সাধারণত ৯৭° থেকে ৯৮·৪° ফারেনহাইটের মত।

তাপমাত্রার সাম্য বজায় রাখার জন্য আমাদের শরীরের অনেকগুলি প্রক্রিয়া কাজ করে। প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে বিপাকীয় প্রক্রিয়া, অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির রসক্ষরণ, স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ, পেশী সঞ্চালন ইত্যাদি প্রধান। ঐ স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে কোন সময় যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় তাহলে দৈহিক তাপের সাম্য বজায় থাকে না। তখনই শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়।

*** জ্বর হওয়াটা কি কোন রোগ?**

না। কোন কোন রোগের উপসর্গ ছাড়া শরীরের তাপবৃদ্ধি অন্য কিছুই নয়। সুস্থ দেহে একদিকে যেমন তাপ উৎপন্ন হচ্ছে অন্যদিকে তেমনই খরচও হচ্ছে। বাড়তি তাপ কিছুতেই থাকতে পারছে না। কোন কোন রোগের আক্রমণ হেতুই দেহে তাপ উদ্বৃত্ত হয়। তখন আমরা জ্বর বলি।

*** জ্বর বেশী হলে মাথায় ও কপালে জল দেওয়া হয় কেন?**

জ্বরের সময় মাথায় ও কপালে জল দিলে জল বাষ্পীভূত হতে থাকে এবং বাষ্পায়নের জন্য যে তাপের দরকার হয় তা মাথা ও কপাল সরবরাহ করে। ফলে দেহ ধীরে ধীরে তাপ হারায়। অর্থাৎ জ্বরের প্রকোপ কমে।

সমস্ত শরীরকে জলে ভেজানো উচিত নয়। শরীর তাপ হারাবে ঠিকই। তবে ঠাণ্ডায় ভয়ানক দুর্বল হবে শরীর। তাতে অন্যান্য রোগও আক্রমণ করার সুযোগ পাবে।

মাথায় কিংবা কপালে জল দিলে শুধু সেই অংশটি তাপ হারাবে না, দেহের অন্যান্য অংশও তাপ হারাবে।

*** অসুখ করে কেন?**

আমাদের চারদিকে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু এবং ভাইরাসের দল। ওরা এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে তো দূরের কথা, অনেক সময় অণুবীক্ষণ যন্ত্রেই ধরা পড়ে না। ঐ জীবাণু ও ভাইরাসদের আক্রমণেই আমাদের অধিকাংশ রোগ হয়ে থাকে। তবে এও সত্য যে, আমাদের চারদিকে যত প্রকার জীবাণু ঘুরে বেড়াচ্ছে

তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে।

* ঠাণ্ডা লাগে কেন ?

জলে পড়লে, বর্ষায় ভিজলে, ভিজে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে অনেক সময় ঠাণ্ডা লাগে। উক্ত কারণগুলির জন্য যে ঠাণ্ডা লাগে এমন নয়। তবে জলে ভিজলে বা ভিজে পরিবেশে থাকলে শরীরটা দুর্বল হয়ে পড়ে তারই ফলে এক জাতীয় ভাইরাস দেহে সংক্রমিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং ঐ ভাইরাসদের দ্বারা আক্রান্ত হলে সর্দি-কাশি হয়। তখনই আমরা বলি ঠাণ্ডা লেগেছে।

* ধূমপান শরীরের পক্ষে কি ক্ষতিকর ?

চিকিৎসাশাস্ত্র ধূমপানকে আদৌ বরদাস্ত করতে পারে না। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, অধূমপায়ী অপেক্ষা ধূমপায়ীরা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় বেশী পরিমাণে। তাছাড়া, বিড়ি, সিগারেটের ধোঁয়া থেকে কাশি ও হাঁপানির সৃষ্টি হয়। এমনকি যক্ষ্মাও হতে পারে।

যে-কোন তামাকের মধ্যে নিকোটিন নামে এক জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ থাকে। ধূমপানের মাধ্যমে নিকোটিন শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে এবং রক্তের চাপকে বাড়িয়ে দেয়। ধূমপানের সময় দেহের শিরাগুলির মধ্যেও সঙ্কোচন আসে এবং হাত ও পায়ের তাপমাত্রা অনেকখানি কমে যায়। যদিও পরে আবার ঠিক হয়ে যায়। তবু সব সময় অনুরূপ প্রতিক্রিয়া চলতে থাকলে শরীরের ক্ষতিসাধন না হয়ে পারে না।

* নিকোটিনের ক্ষতিকারক প্রভাব কি এবং তার ফল কি হয় ?

নিকোটিন পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাৎভাগ থেকে নির্গত ভেসোপ্রেসিন নামক উত্তেজক রস ক্ষরণের হার বাড়িয়ে দেয় ও রক্তনালীকে সঙ্কুচিত করে। উক্ত কারণে ক্যান্সার প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

* ক্যান্সার রোগটি কি ?

শরীরের কোথাও (বাহিরে অথবা দেহাভ্যন্তরস্থ গলনালী, পাকস্থলী, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, রক্ত ইত্যাদিতে) যদি অস্বাভাবিকভাবে কোষবৃদ্ধি ঘটে তাহলে সেখানে শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। কোষবৃদ্ধি প্রথমে টিউমারের আকারে সৃষ্টি হয় তারপর রূপান্তরিত

হয় ক্যান্সারে। পরিশেষে দেহময় ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগীর মৃত্যু ঘটে। প্রাথমিক অবস্থায় যদি ধরা পড়ে তাহলে অপারেশন ও তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে ওকে নিরাময় করানো সম্ভব হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অনেকক্ষেত্রে ক্যান্সার প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়ে না।

সাম্প্রতিক গবেষণাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ক্যান্সারের মূলে আছে কোষ-মধ্যস্থিত কয়েকপ্রকার জিন। জিনরা ডি, এন, এ, অণুর পাশে সুতোর মত জড়িয়ে থাকে এবং প্রতিটি কোষে থাকে প্রায় এক লক্ষের মত। ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোন রাসায়নিক পদার্থ (যেমন:—নিকোটিন প্রভৃতি)-ও কদাচিৎ কোন ভাইরাস কোষ-মধ্যস্থিত ডি, এন, এ-র উপর যদি আক্রমণ চালায় তাহলে কিছু কিছু জিন ক্যান্সার সৃষ্টির মাধ্যম তথা অনকোজিনে রূপান্তরিত হয়। প্রায় ১৫টির বেশী মাধ্যম এ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। এক একটি মাধ্যম এক এক ধরনের ক্যান্সার সৃষ্টি করে থাকে। তবে একটি মাধ্যমের দ্বারা একাধিক ক্যান্সারও সৃষ্টি হতে পারে।

উপরোক্ত মাধ্যমরা স্বাভাবিক কোষে সৃষ্টি হয়ে অচল অবস্থায় থাকলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যত গোল সচল হলেই। সচল হতে গেলেই নানা দিক থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবু কোন ক্ষেত্রে এরা হঠাৎ সক্রিয় হয়ে উঠলে কিন্তু যেখানে সচল হলে বিপদের সম্ভাবনা সেখানে সচল হলে তাদের উপর কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ কাজ করে। ফলে সেগুলো হঠাৎ কিছু করতে পারে না। আর ঐ মাধ্যমগুলি সক্রিয় হলেই অনিয়ন্ত্রিতভাবে কোষ বাড়তে শুরু করে দেয়।

ক্যান্সারের মূলে যেহেতু জিনই দায়ী, সেই কারণে রোগটা বংশানুক্রমেও ঘটতে পারে। তবে সব ক্ষেত্রে হয় না। ধূমপান এবং পান খাওয়া ক্যান্সারের একটা বড় কারণ।

* **ক্যান্সারকে কর্কট রোগ বলা হয় কেন?**

প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসকগণ হিপোক্রাতেশ, গ্যালেন প্রভৃতি এবং ভারতীয় চিকিৎসকরা মনে করতেন, উক্ত রোগের কুফলগুলি কাঁকড়ার দাঁড়ার মত শিরাসমূহের মাধ্যমে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। গ্রীক

ক্যান্সার শব্দের অর্থই কাঁকড়া।

* ক্যান্সার কি কোন নির্দিষ্ট রোগ?

না। একটি গোষ্ঠীর কতকগুলি রোগ। ওরা শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিশেষজ্ঞরা একশ'র মত ক্যান্সারের সন্ধান পেয়েছেন।

* জণ্ডিস রোগ কি?

সাধারণত অল্প বয়সী তরুণরাই এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হলে প্রথমে চোখ ও পরে গায়ের রঙ হলুদবর্ণ ধারণ করে। তাই অনেকে উক্ত রোগকে "ইওলো ফিভার" বলে থাকেন।

রোগটি যকৃতের রোগ। যকৃতে পিত্ত নিঃসরণে কোনরকমে বাধা এলে তখন পিত্ত নিঃসরণ অনিয়মিত হয়। কিছু কিছু পিত্ত রক্তে মিশে যায়। ফলে শরীর হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এই অসুখে বেশীদিন ভুগলে মারাত্মক হয়ে উঠে। কেউ রোগাক্রান্ত হলে যকৃতের পিত্ত নিঃসরণ নিয়মিত করার জন্য আহারের ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

নিয়মিত পাতিলেবু খেলে এই অসুখ কম হয় বলে অনেকে মনে করেন।

* হুপিং কাশি কি?

একরকম ব্যাকটিরিয়াঘটিত অসুখ। সাধারণত শিশুদের হয়ে থাকে। একনাগাড়ে প্রায় ৬ সপ্তাহ ধরে চলে তারপর আবার হয়। সেরে গেলে আর জীবনে হয় না। তবে অনেক সময় রোগটা বড় মারাত্মক হয়ে উঠে। সিরাম ইনজেক্সানের মাধ্যমে রোগটিকে দূর করা হয়।

* ধবল রোগটি কেন হয়?

দেহে মেলানিন নামক একপ্রকার রঞ্জক পদার্থের ঘাটতি ঘটলে ধবল হয়।

* হাঁপানি রোগটি কি?

শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত রোগ। সব বয়সেই হয়ে থাকে। অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনের অভাব ঘটলে বাতাসের ভাসমান

ধূলিকণা ইত্যাদি শ্বাসনালীর মধ্যে প্রবেশ করলেই রোগটি প্রকাশ পেয়ে থাকে।

* আলসার রোগটা কি এবং কেন হয়?

আলসার একরকম ক্ষত। শরীরের যে কোন জায়গায় আলসার হতে পারে। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন জায়গায় আলসার হতে দেখা যায়। পৌষ্টিক নালীর আলসার অত্যন্ত বিপজ্জনক। তবে যে কোন আলসার যদি চিকিৎসার ফলে আরোগ্য না হয় তাহলে সেটি ক্যান্সারের রূপ নেয়। প্রাথমিক অবস্থায়ই আলসারের চিকিৎসা করাতে হয়।

রোগটি সাধারণত অখাদ্য ও কুখাদ্য গ্রহণের ফলে হয়ে থাকে। রসনা তৃপ্তি হয় অথচ শরীরের পক্ষে অহিতকর, এমন খাদ্য আমরা গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করি না। মুখরোচক খাদ্যের জন্য আমরা হোটেল ও রেস্তোরাঁতে ধর্ণা দিই। এসব খাদ্য আলসারের সহায়ক। তাছাড়া আহারে অনিয়ম, মদ্যপান ইত্যাদির ফলেও আলসার হয়ে থাকে।

* ধনুষ্টঙ্কার রোগের কারণ ও প্রতিকার কি?

ব্যাসিলাস টিটানি নামে এক জাতীয় জীবাণুর সংক্রমণের ফলে ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস রোগটি হয়ে থাকে। আমাদের শরীরের ত্বকটা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য একরকম বর্মের মত ঘিরে রেখেছে। সেই ত্বক কোথাও যদি কেটে বা ছিঁড়ে যায় এবং রক্তপাত ঘটে তাহলে ঐ জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। ফলে টিটেনাস রোগে আক্রান্ত হতে হয়।

রোগটা অত্যন্ত মারাত্মক। জীবাণু সংক্রমণের কিছুদিনের মধ্যেই রোগটি আত্মপ্রকাশ করে। তখন রোগীর খিঁচুনি হয়ে থাকে। খিঁচুনির সময় শরীরটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে যায় বলে ধনুষ্টঙ্কার নাম।

বর্তমানে ধনুষ্টঙ্কারের প্রতিষেধক ইনজেকশন আবিষ্কৃত হয়েছে। কেটে বা ছিঁড়ে গিয়ে রক্তপাত ঘটলে কোনরকম দ্বিধা না করে ইনজেকশন গ্রহণ করা উচিত। অথবা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

ইনজেকশন আবিষ্কারের পূর্বে প্রতি বছর বহু লোক উক্ত রোগে প্রাণ হারাতো। বিশেষ করে সন্তানের জন্মদান করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কত মা যে প্রাণ হারিয়েছেন আর জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে কত শিশুর চোখের আলো যে চিরদিনের মত নিভে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

*** পোলিও রোগ কি এবং এর প্রতিষেধক কি?**

পোলিও রোগটিকে আমাদের দেশে শিশু পক্ষাঘাত বলা হয়। উক্ত রোগে আক্রান্ত হলে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কোন না কোন অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারপর সেই অঙ্গটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করে। পরিণামে শিশুটি মারা যায় অথবা চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়।

পোলিওর টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। শিশুর এক থেকে দেড় বছর বয়সের মধ্যে তিনবার পোলিওর টিকা দিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। তাহলেই পোলিও হয় না।

*** ব্রঙ্কাইটিস রোগটি কি এবং কেন হয়?**

ব্রঙ্কাসের প্রদাহকে বলা হয় ব্রঙ্কাইটিস। আমরা শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে যে বাতাস গ্রহণ করি, সেই বাতাস শ্বাসনালীর দ্বারা বাহিত হয়ে ফুসফুসে যায়। শ্বাসনালীটা তলায় দুভাগে বিভক্ত হয়ে ফুসফুসের দুপাশের সঙ্গে যুক্ত। বিভক্ত অংশের বাম দিকটাকে বলা হয় বাম ব্রঙ্কাস এবং ডান দিকটাকে বলা হয় ডান ব্রঙ্কাস।

এক ধরনের ভাইরাসই ব্রঙ্কাসের প্রদাহ সৃষ্টি করে। ওরা আর্দ্র ও কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে এবং ধূলাবালিতে থাকে। দেহে ওদের সংক্রমণ ঘটলে জ্বর, গায়ে যন্ত্রণা, কাশি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। এই রোগ সাধারণত বড়দেরই বেশী হয়ে থাকে।

ভিজে আবহাওয়ায় না ঘুরলে এবং পরিবেশকে ময়লা ও ধুলা-বালি মুক্ত রাখলে এই রোগের সম্ভাবনা কম।

* ব্লাডপ্রেসার রোগটি কি?

আমাদের দেহের রক্ত তরল পদার্থ। অন্যান্য তরলের মত সেও

আমাদের রক্তবহনকারী নালীতে চাপ দেয়। এই চাপকেই বলা হয় রক্তচাপ বা ব্লাডপ্রেসার।

আমাদের হৃৎপিণ্ড রক্ত প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে একবার প্রসারিত হয় এবং পরক্ষণে হয় সঙ্কুচিত। যখন সঙ্কুচিত হয় তখন রক্তনালীতে বেশী চাপ পড়ে এবং প্রসারিত হলে সেই চাপ কমে যায়। তাই রক্তচাপের জন্য সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান আছে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে মান বেশী হয়ে থাকে এবং ছোটদের ক্ষেত্রে হয় কম। কোনপ্রকারে রক্ত চলাচলে যদি বিঘ্ন সৃষ্টি হয় তাহলে ব্লাডপ্রেসার রোগটি সৃষ্টি হয়।

এই রোগটি সাধারণত বড়দের রোগ। তবে ছোটদের যে হয় না এমন নয়। অপরপক্ষে রক্তচাপ বাড়া ও কমা তুইই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। শারীরিক শ্রম ও মানসিক উত্তেজনার সময় দেহের স্বাভাবিক রক্তচাপকেও বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

* হৃদরোগ কেন হয় ?

হৃৎপিণ্ডের রোগই হৃৎরোগ। হৃৎপিণ্ডের কোন প্রকোষ্ঠ অথবা ধমনী প্রভৃতি বিকৃত অবস্থায় অনেকে জন্মগ্রহণ করে। তাদের ক্ষেত্রে রোগটা জন্মগত। তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে নানা কারণে হৃদ্‌রোগ হতে পারে।

বয়স বাড়ায় সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের পেশীগুলির সঙ্কোচনশীলতা কমে আসে এবং হৃৎপিণ্ডের আয়তনটাও বেড়ে যায়। উক্ত কারণে স্বাভাবিকভাবে হৃদরোগ হতে পারে, অন্যদিকে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলেও রোগটি হয়ে থাকে। হৃদ্‌রোগ থাকলে ভয়, উত্তেজনা, ক্রোধ ইত্যাদি চরম ক্ষতিকর। এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

* সন্ন্যাস রোগটি কি এবং কোন কোন কারণে উক্ত রোগটি হয়ে থাকে ?

আমাদের দেহের শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে যে রক্তধারা সব সময় প্রবাহিত হচ্ছে. তার সঙ্গে অক্সিজেন. নানা খনিজ পদার্থ, হরমোন ও অন্যান্য প্রাণধারণকারী পদার্থও প্রবাহিত হচ্ছে এবং দেহের নানাস্থানে ছড়িয়েও পড়ছে।

আমাদের হৃৎপিণ্ড হচ্ছে রক্ত সংবহন কেন্দ্র। বিশুদ্ধ রক্ত ধমনীর মাধ্যমে শরীরের সর্বত্র প্রসারিত হচ্ছে এবং দূষিত রক্ত শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডেই ফিরে আসছে। দূষিত রক্তটা কিন্তু হৃৎপিণ্ডে পড়ে থাকছে না। সেটি শোধিত হচ্ছে এবং পুনরায় ধমনীর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপকে আবার পরিচালিত করে মস্তিষ্ক। ধমনী তার চারদিকে একটা বেষ্টন সৃষ্টি করে রেখেছে এবং সেখানেও রক্তের প্রবাহের মাধ্যমে যাচ্ছে অক্সিজেন ও অন্যান্য উপাদান। কোনপ্রকারে যদি মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহের ঘাটতি ঘটে তাহলে মস্তিষ্কের কিছু কিছু কোষ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয় মানুষ। এই রোগের আক্রমণকে বলা হয় স্ট্রোক।

অন্যান্য আরও অনেক কারণে সন্ন্যাস রোগ হয়। প্রথমত শরীরের কোথাও অস্ত্রোপচার করা হলে অথবা অন্য কোণ কারণে যদি দেহের কোথাও রক্ত জমাট বেঁধে ছোট্ট ডেলার আকার ধারণ করে তাহলে সেটি বাহিত হয়ে মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ধমনীতে আটকে যায়। ফলে রক্ত চলাচলের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং একসময় স্ট্রোক হয়। এই জাতীর স্ট্রোককে বলা হয় সেরিব্রাল এম্বোলিজম।

দ্বিতীয়ত, কোন কারণে যদি মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ধমনীর কোথাও ছিঁড়ে যায় তাহলে মস্তিষ্কেই ঘটবে রক্তক্ষরণ। অত্যধিক রক্তক্ষরণ হেতু মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি একেবারে বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই জাতীয় রোগকে বলা হয় সেরিব্রাল হেমারেজ।

তৃতীয়ত, ধমনী মধ্যস্থিত প্রাচীরের চারদিকে যদি চবির আবরণ সৃষ্টি হয় তাহলে রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি হবে। ক্রমাগত আস্তরণ জমতে জমতে যখন রক্তপ্রবাহের পথটা একেবারে সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়বে তখনই স্ট্রোক হবে। এই ধরনের সন্ন্যাস রোগকে বলা হয় সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস।

থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হলে দেহ হয় পঙ্গু হয়ে যায় নয়ত মৃত্যু ঘটে। নিয়মিত ব্যায়াম বা কিছু দৈহিক পরিশ্রম, মুক্ত-বায়ু সেবন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চর্বি জাতীয় খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস

করলে উক্ত রোগ থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে।

* টিকা কি ?

আমাদের বিভিন্ন রোগের মূলে আছে এক এক ধরনের জীবাণু কিংবা ভাইরাসের সংক্রমণ। অথচ সুস্থ দেহে যে জীবাণুর দ্বারা যে রোগ সংক্রমিত হয় সেই জীবাণুকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় সীমিতভাবে শরীরে প্রবেশ করালে শরীরে সেই রোগের প্রতিষেধক ক্ষমতা লাভ করে। অন্যভাবে বলা যায় যে, স্বল্প পরিমাণ কোন রোগজীবাণুকে শরীরে প্রবেশ করালে শরীরে সেই রোগ প্রতিরোধকারী এক ধরনের প্রোটিন গঠন করে। ঐ প্রোটিনই ভবিষ্যতে উক্ত রোগের আক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করে। টিকা হল বিশেষভাবে রক্ষিতরোগ জীবাণু। আজকাল বহু রোগজীবাণুকে নিয়ে টিকা প্রস্তুত হয়ে থাকে। কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগকে টিকার মাধ্যমে এড়ানো যায়।

* সিরাম কি ?

সিরামকে বিষঘ্ন বা রোগ প্রতিরোধকারী অ্যান্টিবডি বলা যেতে পারে। পূর্বে আমরা দেখেছি বিষপ্রয়োগে অথবা কোন জীবাণুর সংক্রমণ ঘটলে রক্তে আপনা হতে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু প্রতিপক্ষ যখন খুব সবল হয় তখন আপনা হতে তৈরি অ্যান্টিবডি কিছুই করতে পারে না। যেমন, সাপের কামড়ে কিংবা ক্ষ্যাপা কুকুর বা শেয়াল কামড়ালে এত অধিক পরিমাণ বিষ বা ভাইরাস প্রবেশ করে, যাকে প্রশমিত করার ক্ষমতা রক্তের অ্যাণ্টিবডির নেই। তাই বাহির থেকে অ্যান্টিবডির অনুপ্রবেশের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সিরাম ঐ অ্যান্টিবডিকেই বহন করে।

সাপের বিশেষ সিরাম, ধনুষ্টঙ্কারের সিরাম, জলাতঙ্করোগের সিরাম ইত্যাদি বহু সিরাম আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে সাপের বিষের ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে সিরাম প্রয়োগ করতে হয় এবং পরবর্তী ক্ষেত্রগুলিতে রোগ প্রকাশের আগে সিরাম প্রয়োগ না করলে রোগী বাঁচে না।

* জলাতঙ্ক রোগ কি এবং কেন হয় ?

একরকম ভাইরাসঘটিত রোগ। ক্ষ্যাপা কুকুর, শেয়াল, নেকড়ে প্রভৃতি কামড়ালে এই রোগ হয়ে থাকে। ভাইরাসরা ওদের লালায় বাসা বাঁধে। কামড়ালে ভাইরাসগুলি সুস্থদেহে অনুপ্রবেশ করে।

ভাইরাসগুলি অত্যন্ত মারাত্মক। কামড়ানোর প্রায় সাতদিনের মধ্যেই রোগটি আত্মপ্রকাশ করে। রোগটির লক্ষণ, রোগীর জলকে ভয় পাওয়া, অস্থিরতা ইত্যাদি। জল দেখে ভয় পায় বলে ওকে জলাতঙ্ক বলা হয়।

জলাতঙ্ক দু'রকমের। উগ্র জলাতঙ্ক ও মূক জলাতঙ্ক। মূক জলাতঙ্কের ক্ষেত্রে রোগী ঝিমিয়ে পড়ে থাকে। রোগের আত্মপ্রকাশের পূর্বে প্রতিষেধক সিরাম ইনজেক্শন না করলে রোগী বাঁচে না। কখনও কখনও এই রোগ অনেক দেরীতেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে। অতএব কুকুর থেকে সাবধান। কে বলতে পারে, অপরিচিত ঐ কুকুরটা পাগল নয় ?

যে কোন কুকুর কামড়ালে তাকে বেঁধে রাখতে হয়। সাতদিনের মধ্যে যদি ওটা মরে যায়- তাহলে বুঝতে হবে ওর দ্বারা জলাতঙ্ক হবেই।

* অ্যালার্জি কাকে বলে ?

"অ্যালার্জি" নামে কোন রোগ চিকিৎসাশাস্ত্রে উল্লেখ নেই। যার আক্ষরিক অর্থ "আমি কিছুই জানি না" বা যা থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না ইত্যাদি। এই "অ্যালার্জি" শব্দটি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্যবহৃত হয়েছে।

অ্যালার্জি বলতে সাধারণত যা বোঝায় তা হল, যেসব বস্তু থেকে দৈহিক প্রতিক্রিয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না সেইসব বস্তু কোন কোন মানুষের ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ প্রতিরক্ষা সৃষ্টি করে। যেমন ধরা যেতে পারে, চিংড়ি মাছ, ডিম প্রভৃতি আমরা হামেশাই খাচ্ছি। খেতেও সুস্বাদু। কিন্তু এমন কিছু কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা ডিম, চিংড়ি মাছ ইত্যাদি সহ্য করতে পারেন না। খেলে সারা শরীরটা চাকা চাকার

মত ফুলে উঠে অথবা দেহে অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশ পায়। এমন প্রতিক্রিয়াকে আমরা অ্যালার্জি বলে থাকি।

কেবল চিংড়ি মাছ ও ডিম নয়, কারও আছে পেঁয়াজ-রসুনে অ্যালার্জি, কারও দুধে অ্যালার্জি, ইত্যাদি। খাওয়া ছাড়া অন্যত্রও অ্যালার্জি লক্ষ্য করা যায়। যেমন কেউ কেউ গায়ে সাবান দিতে পারেন না, মাথায় তেল দিতে পারেন না, ধোঁয়া ধূলা-বালি সহ্য করতে পারেন না ইত্যাদি। অনেকে পারেন, অথচ একজন কেন পারেন না—সেইটেই সমস্যা। তাই অ্যালার্জিকে আমরা ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করে থাকি।

আসলে কোন কোন মানুষের ক্ষেত্রে তাদের দেহকোষগুলি কোন কোন বস্তুর প্রভাবে পড়লে অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠে। এর ফলে অনেক সময় কিছু কিছু কোষ ক্ষতিগ্রস্তও হয়। উক্ত কারণে কোন কোন চর্মরোগ, সর্দি, কাশি, হাঁপানিতে আক্রান্ত হতে হয়। তাই অ্যালার্জিসম্পন্ন মানুষরা যাঁদের যে বস্তুর প্রতি অ্যালার্জি আছে সেই বস্তুটিকে সব সময় এড়িয়ে চলেন।

* **পেনিসিলিন কি ?**

পেনিসিলিন নোটেটাম জাতীয় এক ধরনের ছত্রাক থেকে প্রস্তুত অসাধারণ গুণসম্পন্ন ওষুধ। যে কোন জীবাণুঘটিত রোগে পেনিসিলিন আশ্চর্য ফল প্রদান করে।

* **অ্যান্টিবায়োটিকস কাদের বলা হয় ?**

এক এক ধরনের জীবাণু বা ছত্রাক থেকে প্রস্তুত রাসায়নিক পদার্থ যা জীবাণুঘটিত রোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ। টেরামাইসিন, ওরিওমাইসিন, সুবামাইসিন ইত্যাদি আজকের দিনেও মূল্যবান ওষুধগুলি সবই অ্যান্টিবায়োটিকস্। এমনকি পেনিসিলিনও।

* **ট্রেপটোমাইসিন কি ?**

যক্ষ্মা রোগের মহৌষধ একটি অ্যান্টিবায়োটিক। ট্রেপটোমাইসেস গ্রিসিয়াস নামক এক ধরনের জীবাণু থেকে রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত করা হয়।

* **এক্স-রে কি ?**

এক্স-রে বা এক্স-রশ্মি এক ধরনের তড়িৎচুম্বকীয় রশ্মি। সাধারণ আলোক রশ্মি কাগজ, চামড়া ইত্যাদিকে ভেদ করে অগ্রসর হতে পারে না। কিন্তু এই রশ্মি কাগজ, চামড়া, মাংসপেশী প্রভৃতি ভেদ করে অবাধে যেতে পারে, কিন্তু হাড়কে ভেদ করতে পারে না। তাই সাধারণ আলো থেকে এক্স-রশ্মির প্রকৃতি ভিন্ন।

এক্স-রশ্মিকে সাধারণত ক্যাথোড রশ্মির নলে তড়িৎমোক্ষণ ঘটিয়ে উৎপাদন করা হয় এবং একে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানী রঞ্জেন। ঐ রশ্মি চামড়া, মাংসপেশী ইত্যাদিকে ভেদ করে যেতে পারে বলে শরীরের কোথাও হাড় ভেঙে গেলে অথবা পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির ছবি গ্রহণ করতে হলে এক্স-রশ্মির সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

* টমোগ্রাফী কি ?

টমোগ্রাফী এক ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা। পুরো নাম কমপিউটারাইজড অ্যাকসিয়াল টমোগ্রাফী। শরীরের অভ্যন্তরে টিউমার ইত্যাদি হলে এক্স-রের সাহায্যে বিভিন্ন কৌণিক অবস্থান থেকে টিউমারের ছবি গ্রহণ করা হয়। তারপর যন্ত্রগণকের সাহায্যে ছবিগুলি যুক্ত হয়ে টিউমারের একটি ত্রিমাত্রিক ছবি গঠন করে। ফলে টিউমারের প্রকৃতি, তার আকার ও আয়তন এবং প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করতে অসুবিধা হয় না। উক্ত ব্যবস্থাই টমোগ্রাফীর অন্তর্ভুক্ত।

* তেজস্ক্রিয় পদার্থ কি এবং তার দ্বারা কিভাবে চিকিৎসা করা হয় ?

এমন কতকগুলি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের দেহ থেকে সর্ব-অবস্থায় অনর্গল ও অবিরামভাবে এক ধরনের রশ্মি নির্গত হয়। এইগুলিই তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এদের প্রকৃতিতে অতি সামান্যই পাওয়া যায়। তাই বিজ্ঞানীরা সাধারণ মৌলিক পদার্থকে যন্ত্রের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করেন। ক্যান্সার, টিউমার প্রভৃতিকে নিরাময় করার জন্যই ঐসব পদার্থকে প্রয়োগ করে থাকেন চিকিৎসকরা। তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গমনের ফলে ক্যান্সার দুষ্ট কোষগুলিকে বিনষ্ট করে।

রেডিয়াম এই ধরনেরই একটি পদার্থ। অন্যান্য কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়

পদার্থ যেমন বিসমাথ-২০৬, কোবাল্ট-৬০, আয়োডিন-৩১, এমনকি খাদ্য লবণকেও তেজস্ক্রিয় করে বিভিন্ন ধরনের টিউমারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

* **আবিষ্কার ও আবিষ্কারক :**

রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি—উইলিয়ম হার্ভে।

বসন্তের টিকা—এডওয়ার্ড জেনার।

অচেতন করার উপায়—সিম্পসন।

কলেরার জীবাণু—রবার্ট কোখ।

জলতঙ্কের প্রতিষেধক—লুই পাস্তুর।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু—রোনাল্ড রস।

কালাজ্বরের ওষুধ—ইউ. এন. ব্রহ্মচারী।

পেনিসিলিন—আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং।

ডিপথেরিয়ার প্রতিষেধক—ভন বেহরিং।

পরিপাক ক্রিয়া—পি. পাভলভ।

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন—ক্যামিলো গলজি।

অ্যালার্জি—আর, রিচেট।

ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফ যন্ত্র—আইন টোভেন।

রক্তের শ্রেণীবিভাগ—কার্ল-ল্যাণ্ড স্টিভেন।

মস্তিষ্কের কার্যাবলী—আর. হেম।

পীত জ্বরের প্রতিষেধক—ম্যাক্স থেলার।

যক্ষ্মার প্রতিষেধক—এ. ওয়াক্সম্যান।

পোলিওর প্রতিষেধক—জোনস্ সাল্ক।

হরমোনের গঠন—সি, ক্যাণ্ডল, হেনচ ও রাইখস্টাইন।

জিনের কাজকর্ম—বিডল, লিডারবার্গ ও টাটুন।

জেনেটিক কোডের ব্যাখ্যা—হোলি, নিরেনবার্গ ও খোরানা।

এক্স-রে—রঞ্জেন।

স্টেথসস্কোপ—লেনেক।

টমোগ্রাফি—হাউসফিল্ড।